ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য

প্রদীপ আচার্য

শ্রীহরি প্রকাশন
পুরাতন কালীবাড়ী লেন
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

প্রথম প্রকাশ

১০ই ফাল্গুন ১৩৯৬
২২শে ফেব্রুঃ ১৯৯০

প্রকাশক

বিষ্ণুপদ আচার্য
শ্রীহরি প্রকাশন
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

প্রচ্ছদ শিল্পী

শ্রীঅপরেশ পাল

মুদ্রণে ঃ

সুনীতি প্রিন্টার্স
ভট্টপুকুর, আগরতলা।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

গ্রাফিকা আর্টিষ্টিক
কনসার্ণ, বনমালীপুর।

**Tripureswari O
Dhainya Manikya,
A Historical Novel by
Pradip Acharya**

লেখকের প্রকাশিত উপন্যাস

★ পথের প্রদীপ
★ গোমতীর স্বপ্ন
★ দুই অধ্যায়
★ জীবন যে রকম
★ হোয়াইট শিকার
★ অসবর্ণ
★ সমসের গাজী
(ঐতিহাসিক)
★ অমৃত লোকের সন্ধানে
★ ফুলকুমারী (কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য—কুড়ি টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার সিংহ

ও

শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি কর

—শ্রদ্ধাভাজনেষু

ভূমিকা

মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তার সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক প্রভৃতি বিষয়ের প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

ধন্যমাণিক্যের সিংহাসনে আরোহনের বিষয়টি নিয়ে রাজমালা প্রণেতাগণ একমত হতে পারেননি। আবার ধ্বজকুমারকে কেউ কেউ ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা ধন্যমাণিক্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ত্রিপুরার ইতিহাসকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে "ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য" লেখা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় রাজমালা গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করায় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

উপন্যাসটি পাঠক/পাঠিকাদিগকে আনন্দ দিতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে হবে।

বিনীত—

লেখক

ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য

ধন্য কুমারকে নিয়ে মা ও মায়ের প্রধানা সখীবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা, একদিন পরই ধন্য রাজা হবে। মায়ের বুক পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরপুর। রাজা হলে পর পুত্রকে আর এমনি ভাবে কাছে পাওয়া যাবেনা। স্বামীকেও পায়নি। তখন যেমন একদল খোশামোদকারী রাজাকে সর্বদা ঘিরে থাকে তেমনি মন্ত্রীবর্গ, পারিষদ প্রভৃতির জন্যও রাজ মাতাগন পুত্রকে কাছে পাওয়া দূরে থাকুক, খোজখবর নেওয়ারও সুযোগ পায়না। তবুও পুত্র রাজা এই আনন্দে মায়ের মন সর্বদা খুশীতে ভরপুর থাকে।

একজন সখী রাণীকে বললো রাণীমা, এত মশগুল হয়ে কী ভাবছো? রাজা হওয়ার যেমন আনন্দ আছে তেমনি দুঃখও আছে স্বর্গীয় মহারাজের কথাই ভেবে দেখোনা হয়তো খেতে বসেছেন এমন সময় দূত জরুরী সংবাদ নিয়ে এলো আর খাওয়াই হলোনা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ যাত্রা করলো। তখন স্ত্রী কিংবা মায়ের মনের অবস্থা কেমন হয়? তোমার নিজেরও তো এমন অভিজ্ঞতা একাধিকবার হয়েছে। রাজাকে তখন শুধু মা কিংবা স্ত্রীর কথা চিন্তা করলে চলেনা, সমগ্র দেশের কথা, সকল প্রজার কথাই ভাবতে হয়। তবে আমাদের ধন্য অন্য ধাতুতে গড়া। মা যতদিন জীবিত আছে ততদিন শান্তির খোঁজে মায়ের আঁচলের সন্ধান করবে।

সখীর কথা শুনে হাসলো রাণী, হাসলো ধন্য। ধন্য বললো মা, মাসী সত্য কথাই বলেছে। যখন কোন মুশ্‌কিলে পড়বো, মুশ্‌কিল আসানের জন্য তোমার কাছেই আগে ছুটে আসবো। তুমিতো আমাদের অন্যান্য রাণীদের মতো ধাইমার দুধ খাইয়ে আমাদের বড় করোনি, প্রতাপ জন্মগ্রহণ করার পরও আমি তোমার বুকের দুধ খেয়েছি। তোমার সেই দুধের ঋণ এ জন্মে কেন জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ করা যাবেনা। তুমি শুধু আশীর্বাদ করো তোমার ধন্য যেন প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখতে পারে। রাজা হলে, রাজ্য চালাতে গেলে যুদ্ধ করতে হবে হয়তো শহীদও হতে হবে। তারজন্য আমার কিংবা তোমার ভাবলে চলবেনা। বাবার রাজত্ব কালে বাবার সঙ্গে একাধিকবার আমি যুদ্ধে গেছি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। তা ছাড়া পুরোহিত ঠাকুর দয়াময় যার স্নেহ ভালবাসায় লালিত-পালিত তিনি সদা-সর্বদা আমাকে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করবেন। তা ছাড়া আমাদের বিশ্বস্ত সেনানায়কগণ সকলেই আমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন একমাত্র সেনাপতি সিংহ নারায়ণকে নিয়েই আমার কিছুটা ভাবনা ছিল। কারণ মাঝে মাঝেই আমি তার মধ্যে সিংহাসন লাভের একটা সুপ্ত বাসনা প্রত্যক্ষ করেছি। সেও এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। মা তোমাদের অনুষ্ঠান একটু তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করো। কাল ভোরে আমার রাজ্যাভিষেক হচ্ছে তার আগে আজ রাতেই আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিয়ে আমাকে একবার বসতে হবে।

একজন দাসী স্বর্ণ থালায় করে কিছু পায়েস আর একজন দাসী রূপোর পাত্রে করে জল নিয়ে এলো। রাণী ধন্যকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে শুরু করলে একজন দাসী

এসে প্রণাম করে রাণীকে বললো— রাণীমা, যুবরাজের একজন বিশ্বস্ত লোক যুবরাজের সঙ্গে জরুরী কথা বলার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। বলেছেন সংবাদটা এত জরুরী যে যুবরাজকে এক্ষুণি সংবাদটা পরিবেশন করতে হবে।

ধন্য খবর শুনেই উঠে চলে যাচ্ছিল কিন্তু, রাণী তাকে বাঁধা দিয়ে বললো—বাবা, মায়ের হাতে একটু পায়েস মুখে দিয়ে যাও। সামান্য সময়ের জন্য তোমার • কোন অমঙ্গল হবেনা। চতুর্দ্দশ দেবতা তোমায় রক্ষা করবেন।

ধন্য দু-এক চামচ মুখে দিয়েই জল খেয়ে অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে এলো। সামান্য দূরেই দাড়িয়ে আছে আচরংফা। ধন্য যেতেই কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললো— যুবরাজ দয়াময় পুরোহিত তোমাকে এক্ষুণি জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। তুমি এই মুহূর্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ না করলে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। মহাদেবী কমলাকে নিয়ে তুমি এক্ষুণি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলো। বাইরে সিদ্ধি কুমারের নেতৃত্বে কয়েক জন অশ্বারোহী তোমার অপেক্ষায়। তুমি গেলেই তারা যাত্রা করবে।

ধন্য কুমার মুহূর্তের জন্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হলেও মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলো। বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই অন্যতম সেনাপতি সিংহ নারায়ণ কোন ষড়যন্ত্র করেছে। এক প্রকার ছুটে গিয়েই মাকে প্রণাম করে বললো—মা, আমি একটি জরুরী কাজে এই মুহূর্তে একটু প্রাসাদের বাইরে যাচ্ছি। তোমার বধূ কমলাও যাবে আমার সঙ্গে, তুমি আমার শিশু পুত্রদের কিছুক্ষণের জন্য দেখে রেখো। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো, দেখো এ খবর যেন আর কেউ না জানতে পারে।

স্বল্পালোকে পুত্রের মুখে অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য করলেও

কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার ভরসা পেলোনা। রাজনীতি এমনই জিনিষ রাজাকে কিংবা যুবরাজকে সব ব্যাপারে প্রশ্ন করে বিব্রত না করাই ভালো। সব সময় সব কথা প্রাণের মানুষকেও বলা যায়না, বলা উচিত নয়।

ধন্য কমলাকে নিয়ে যখন রাজ প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে ছদ্মবেশে সিদ্ধি কুমারের কাছে এসে পৌঁছলো রাত তখন এক প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

কমলা স্বামীকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পায়নি। কমলাও নিজের সখীদের নিয়ে তখন আনন্দে মশগুল ছিল। স্বামীর রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও পাটরাণীর আসন দেওয়া হবে। এই ব্যাপারেই সখীরা কমলার সঙ্গে আনন্দ উৎসব করছিল। ভাবী মহারাজকে স্বাগত জানাতে নিজের শোবার ঘর বাসর সাজে সজ্জিত করে রেখেছিল। রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে অপেক্ষমান ঘোড়া দেখে বুঝতে পারলো তাদের বাসর শয্যা আজ রাতে কোথায় রচিত হবে তার ঠিক্ নেই। কিন্তু, রাজনীতি বড় কঠিন ও নির্মম। দায়িত্ব প্রাপ্ত রাজপুরুষ ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে গেলে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়।

পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে ধন্য এসে পৌঁছিলো প্রধান পুরোহিত দয়াময় চন্তাই এর বাড়ীতে। দয়াময় বারান্দায় যেন তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরা পৌঁছানো মাত্র দয়াময় তাদের নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আচরংফা ও সিদ্ধি কুমার ঘোড়া গুলোকে চন্তাই এর আস্তাবলে নিয়ে বেঁধে রাখলো। তারপর দু-জন সৈনিককে প্রহরায় রেখে চন্তাই এর বাড়ীর বৈঠক খানায় গিয়ে বসলো।

কক্ষটি বেশ বড় সড়। চারটি পিলসুজের প্রদীপ জ্বলছে। একজন দাসী থালায় করে পাত্রে পাত্রে খাবার সাজিয়ে নিয়ে

এলো। দয়াময় বললো—ধন্য, আগে খেয়ে নাও, তারপর বলছি কেন তোমায় এই মুহূর্তে খবর পাঠিয়ে নিয়ে এলাম।

ধনার মনে অদম্য কৌতূহল এবং আশংকা থাকলেও সে খাবারে হাত দিল। কমলা চলে গিয়েছিলো অন্দর মহলে সেখানে তাকেও খাবার পরিবেশন করা হলো।

খাবার শেষ হলে দয়াময় বললো— বৎস, তুমিতো রামায়ণের কাহিনী শুনেছ। তোমাকে আমি কয়েকবার রামায়ণের কাহিনী শুনিয়েছি। রামের রাজ্যাভিষেকের আগের দিন অযোধ্যায় যে নাটক অভিনিত হয়েছিলো এখানেও তেমনটি হতে চলেছে। একমাত্র তোমার শ্বশুর প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ ছাড়া তোমার পক্ষে কেউই নেই। এ অবস্থায় এই মুহূর্তে তোমার রাজপ্রাসাদে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্ত সেনাপতিরা মিলে ঠিক্ করেছে তোমার ছোট ভাই প্রতাপকে সিংহাসনে বসাবে। আমি আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা এ খবর সংগ্রহ করে তোমার শ্বশুরের ওখানে লোক পাঠিয়েছিলাম। তোমার শ্বশুরও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে এই মুহূর্তে তোমাকে সাহায্য করার অক্ষমতা জানিয়ে তোমাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আজ রাতেই প্রচার করে দেওয়া হবে ধন্য রাজ্য সুখ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছে। নইলে যে কোন সময় তোমাকে হত্যা করানো হতে পারে। তোমার বনবাসের খবর প্রচারিত হলে তুমি যে ছোট ভ্রাতার সিংহাসন প্রাপ্তিতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্দ হউনি সেনাপতিরা সে কথা ধারণা করে তোমাকে খুঁজে বের করে হত্যা করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করবে।

কমলা একটু পরেই তোমার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে কান্নাকাটি করে প্রচার করবে যে তুমি রাজ্য সুখ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছ। তোমার মাও সে কথাই জানবে। তোমার বন্ধুরাও

সৈন্যদের মধ্যে সে কথা প্রচার করবে। রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে তোমার বন গমনের কথা রাজধানীতে ভালো ভাবে প্রচার হয় সে ব্যবস্থা করবো।

কমলা দয়াময়ের কাছে সব কথা শুনে তখনি কান্না শুরু করলো। দয়াময় বললো— মা, বিপদে ধৈর্য্য হারা না হয়ে তোমার বাবার কাছে গিয়ে এমনি ভাবে কান্নাকাটি করে তোমার স্বামীর সংসার ত্যাগের কথা ঘোষণা করবে। তুমি কোন চিন্তা করোনা সুদিনে তোমাদের সব হবে আর সে দিনের জন্য বেশীদিন অপেক্ষাও করতে হবেনা। ক্ষমতা লোভী সেনা-পতিদের আমি জানি, প্রতাপকেও জানি। তাদের সম্পর্ক খুব অল্প কালই স্থায়ী হবে। তুমি যাও। আচরংফা, সিদ্ধি কুমার তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌছে দেবে। ধন্যকে আমি অন্য কোন গোপণ স্থানে পাঠিয়ে দেব।

কমলা চোখের জল মুছতে মুছতে বাপের বাড়ী এসে হাজির হলো। একমাত্র দৈত্যনারায়ণ ছাড়া তখনো তাদের বাড়ীর কেউ এ কথা জানে না যে ধন্য মাণিক্য রাজা না হয়ে প্রতাপ রাজা হচ্ছে। তাই হঠাৎ করে ধন্যের সংসার ত্যাগী হয়ে বন গমনের সংবাদে মেয়ের সঙ্গে মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও কান্নায় যোগ দিলো।

প্রতাপ যখন শুনলো তার বড় ভাই ধন্য সেচ্ছায় বন গমন করছে তখন সে হাফ্ ছেড়ে বাঁচ্লো। ধন্য যদি বনে না গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো তাহলে মৃত্যুই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হতো। লোকে ভ্রাতৃহত্যা বলেও তাকে অপবাদ দিতো, এখন নিস্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করার সুযোগ আসায় আনন্দে জলসাঘরের দিকে যাত্রা করলো।

সেনাপতি সিংহ নারায়ণ একথা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। ভেবে ছিল দৈত্য নারায়ণ নিশ্চয়ই কোন চাল

চেয়ে জামাতা ধন্য:কে রাজা করতে প্রয়াসী হবেন কিন্তু, এভাবে প্রতিদন্দ্বীকে বিজয়ী করার কোন কারণ আছে কিনা তা ভাবতেই পারলোনা। অন্য সেনাপতিরা বললো— প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কোন রূপ প্ররোচনা থাকলে ধন্য অবশ্যই বিদ্রোহ করতো। আসলে ধন্য ছোট সময় থেকেই চন্তাই এর সঙ্গে বেশী মাখা-মাখি করাতে সংসারের প্রতি বিরাগী হয়ে বনে চলে গেছে। আহা বেচারী কমলা! বিয়ের তিনটি বৎসরও স্বামীকে কাছে পেলোনা।

একজন সেনাপতি হাসতে হাসতে বললো—কমলার কপাল একদিকে ভালোই বলতে হবে। বনে গেলেও বেঁচে তো রইলো। রাজপ্রাসাদে থাকলে কি আর বাঁচিয়ে রাখতাম।

১৪৬৩ খৃঃ মাঘীপূর্ণিমাতে ধন্যে'র রাজ্যাভিষেক হওয়ার কথা ছিলো, রাজ্যাভিষেক হলো প্রতাপের। প্রতাপ, জেষ্ঠ্যভ্রাতার এই মহান আদর্শের জন্য ভগবানের কাছে তার দীর্ঘ জীবন এবং সাফল্য কামনা করলো। কমলার পরিবর্তে প্রতাপের মহিষী সুভদ্রা পাটরাণীর পদে ভূষিতা হলো।

প্রজাবর্গ ধন্য'র জন্য আফ্‌সোষ করলেও প্রতাপের কাছ থেকে প্রভূত পরিমানে দান পেয়ে সকল প্রজাই প্রতাপের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরলো।

দয়াময় কাক ভোরেই ধন্যকে ছদ্মবেশে দু-জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে রামপুরে কৃপাহা চৌধুরীর বাড়ী পাঠিয়ে দিলো। ধন্যকে বললো সে যেন কোন সময়েই নিজের পরিচয় প্রদান না করে। এ দিকের অবস্থা বুঝে আবার তাকে নিজ বাড়ীতে আনার ব্যবস্থা হবে।

কৃপাহা ধন্যকে দয়াময়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেই জানে। সুদর্শন, বিনয়ী, প্রবোধ নাম ধারী ধন্যকে কৃপাহা এবং তার বাড়ীর লোকজনদের খুবই ভালো লাগে।

কৃপাহার ছেলে কর্ণমণির সঙ্গে সে বিকেলে গোমতী নদীতে নৌকা বিহারে বের হয়। ছবি মুড়ার সৌন্দর্য্য দেখে, মনে মনে ছেলে ও স্ত্রীর জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে। ধন্য'র উদাস ভাব দেখে কর্ণমণি জিজ্ঞেস করে—কী ভাবছো, প্রবোধ ভাই? আমাদের এখানে তোমার ভালো লাগেনা?

— কেন ভালো লাগবেনা? প্রকৃতি এখানে কত সুন্দর। গোমতীর দু-ধারে সু উচ্চ পাহাড়ের কী অপরূপ শোভা। এই অপরূপ শোভায় মোহিত হয়ে নিজেকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি।

—চন্তাই এর আত্মীয় তো, বাস্তবের চাইতে ভাবনার জগতেই বিচরণটা বেশী। আমরা ক্ষত্রিয় মানুষ, অতশত কল্পনার জাল বুনতে জানিনা। সব সময় কান পেতে থাকি কখন যুদ্ধের দামামা বাজবে। শুনলাম যুবরাজ ধন্য রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। প্রতাপ মহারাজ হয়েছে। রাজ্যের যে কী অবস্থা হবে ভেবে পাইনা।

— কেন? প্রতাপতো ভালো যোদ্ধা। বীর-পুরুষ! রাজনীতি অবশ্য কম বুঝে কিন্তু, তার জন্য তো মন্ত্রীরা রয়েছে। যুদ্ধের জন্য রয়েছে ত্রিপুরার বাছাই করা সৈন্য ও সেনাপতি। আর যে রাজ্যে তোমার মতো দেশভক্ত বীর যোদ্ধা রয়েছে সে রাজ্যের বিপদের কোন আশংকাই নেই।

— বিপদের আশংকা বাইরে নয়, ভেতরের। কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হবে সেনাপতিদের ক্ষমতার লড়াই। কে কত ক্ষমতা লাভ করতে পারবে তার প্রতিযোগীতা শুরু হবে আর এই প্রতিযোগীতার পরিণাম হবে গৃহ যুদ্ধ!

— তোমার শুধু মাত্র অস্ত্র জ্ঞানই নয়, রাজনৈতিক জ্ঞানও যথেষ্ট রয়েছে দেখছি। তুমিতো যোদ্ধা, আমি পুরোহিতের আত্মীয় অস্ত্রবিদ্যায় তেমন দখল নেই, তুমি আমাকে অস্ত্রবিদ্যা।

শেখাবে ?

— আমিই বা কতটুকু জানি ! বাবা হলে নিশ্চয়ই তোমায় ভালো তরবারী শিক্ষা দিতে পারতেন। তবুও তুমি যখন বলছো আর আমারও কিছুদিন অবসর রয়েছে তোমায় যতটুকু জানি ততটুকুই শিক্ষা দেব।

ধন্য অস্ত্রবিদ্যা ভালোই জানে কিন্তু, এ ভাবে অবসাদের মধ্যে দিন কাটালে শিক্ষায় ভাটা পড়তে পারে এই ভেবে তরবারীর ঝন্‌ঝনানির মাঝে মনকে চাঙ্গা করে তোলার সামান্য প্রচেষ্টা।

প্রথমদিন অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার পর কর্ণমণি বললো— প্রবোধ, তুমি তো তবরারী চালনা খুব ভালোই জানো দেখছি। এভাবে শক্তির অপচয় না করে রাজার সৈন্য বাহিনীতে ভর্ত্তি হয়ে গেলে তোমার এবং দেশের উভয়েরই উপকার হবে।

মৃদু হেসে ধন্য বললো—সামান্য শিখেছি আত্মরক্ষার তাগিদে। পূজোর কাজে চন্তাইকে সাহায্য করাই আমার কাজ। সব সৈন্য বাহিনীতে চলে গেলে পূজো-পার্ব্বন কী করে চলবে ? তুমি যতদিন বাড়ী আছো ততদিন কিছু সময় তোমার সঙ্গে তরবারী চালনা করে বিদ্যেটাকে একটু চালু রাখতে চাই।

প্রসেনজিৎ, সিংহ নারায়ণ প্রভৃতি দক্ষ সেনাপতিরা সভায় মিলিত হয়েছে। প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকেও ডাকা হয়েছে। পূর্ব্বে সব বিষয়ে দৈত্য নারায়ণকে ডাকতে সঙ্কোচ হতো। ধন্য দৈত্য নারায়ণের মেয়ের জামাই। ধন্যকে সিংহাসনচ্যুৎ করে প্রতাপকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে হয়তো আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু, এখন আর সে ভয় নেই। প্রতাপ মাণিক্য সকলের পক্ষেই সমান।

সিংহ নারায়ণই প্রথম কথা বললো। বললো— প্রতাপ

মাণিক্য এখনো ছেলে মানুষ, ধন্যকে নিয়ে যা করানো যেতনা প্রতাপকে দিয়ে তা করানো যাবে। তা ছাড়া প্রতাপ যে আমাদের জন্যই সিংহাসন পেয়েছে একথা সে কেমন করে অস্বীকার করবে? ধন্য সেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ না করলে আমরা তাকে হত্যা করতাম। সুতরাং প্রধান সেনাপতি মশায় আপনিই বলুন কেমন করে আমরা ক্ষমতা লাভ করতে পারি?

— সিংহ নারায়ণ, আমি জানি প্রতাপ মাণিক্য নেশা করে তা ছাড়া সুন্দরী মেয়েদের প্রতিও তার দুর্বলতা রয়েছে আমরা যদি ঢাকা থেকে কিছু ইরাণী নর্তকী আনতে পারি তা হলে প্রতাপ মাণিক্যকে তারা তাদের সাহচর্য্য ও সুরা দিয়ে রাজকাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। তখন আমরা যে যার কাজ গুছিয়ে নিতে সমর্থ হবো। তোমরা একমত হলে কালই পাঠান সেনাপতিকে ডেকে ইরাণী মেয়ে আনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

—আমরা এ প্রস্তাবে একমত। যে কোন প্রকারেই হউক আমাদের কর্তব্য রাজকাজ থেকে প্রতাপকে দূরে সরিয়ে রাখা।

দৈত্য নারায়ণের পরামর্শ অনুযায়ী পাঠান সেনাপতি ফজল আলিকে ঢাকা পাঠানো হলো সুন্দরী ইরাণী নর্ত্তকী নিয়ে আসতে।

প্রতাপ মাণিক্য সিংহাসনে গিয়ে বসে, রাজকাজ করার কোন সুযোগই পায়না। পিতা ধর্ম মাণিক্যের আমলে যেমন মাঝে মাঝে বিচার প্রার্থীরা বিচার নিয়ে আসতো এখন আর কেউ আসেনা। রাজ্যের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে প্রধান সেনাপতি উত্তর দেয় খুব ভালো। তারপর আর কি আলাপ হতে পারে? বয়সে সকলেই বাবার বয়সী। তাদের সঙ্গে হাসি মস্করা চলেনা। তাই ঘণ্টা খানিক রাজ সিংহাসনে বসে

থেকে সভা ভঙ্গ করে দিয়ে চলে আসে। পরিষদরাও যেন তাই চায়। অযথা নিস্কর্মার মতো রাজসভায় বসে থেকে কি লাভ?

প্রতাপ সিংহাসন থেকে বেরিয়ে বয়স্যদের নিয়ে জলসাঘরে যায়। সে শুনেছে প্রধান সেনাপতি নূতন নর্তকী আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে। বর্তমানে যারা রয়েছে তারা সকলেই পুরনো। তাদের নাচ গান-গানও পুরনো। কিছুক্ষণ জলসাঘরে থাকলেও প্রতাপ হাঁপিয়ে উঠে। মনে মনে ভাবে রাজা না হলেই যেন ভালো ছিলো। রাজা হয়ে কি পেয়েছে সে? একজনও বিচার প্রার্থী হয়ে তার কাছে আসেনি। একজন ভিক্ষুকও তার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসেনি।

আগে বন্ধুদের নিয়ে শিকারে যেতো, যুদ্ধ বাঁধলে বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যেতো। যুদ্ধ না করলেও যুদ্ধ পরিচালনা কিভাবে করতে হয় তা সে দেখেছে। বয়স্যরা পরামর্শ দিলো চলুন মহারাজ, একদিন অমরপুরে শিকার করতে যাই। শিকার করলে মনটাও হাল্কা হবে জনসাধারণের সঙ্গে মেশারও সুযোগ পাবেন।

মহারাজ বললো তাই চলো। কোন কাজ কর্ম না থাকায় একদম ভালো লাগছে না। আমি রাজা, আমার কাছে কেউ কোন কাজের জন্য আসবেনা, একি ভালো লাগে বলো?

প্রতাপ মাণিক্য শিকারের কথা 'সেনাপতিদের বলতেই সেনাপতিরা বললো—মহারাজ, মাত্র দু-মাস হলো সিংহাসনে বসেছেন। আমরা রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনেক প্রজাই বলা-বলি করছে ধন্যকে জোর করে বনে পাঠিয়ে আপনি রাজা হয়েছেন আপনি অন্যায় করেছেন। আমরা ওদের বুঝাতে চেষ্টা করছি। তা ছাড়া

আপনি এখনো রাজকার্যে নূতন। নিজে কিছুদিন রাজসভায় হাজির থেকে পারিষদবর্গের মনোভাব বুঝার চেষ্টা করা দরকার। আপনি, কিছুদিন পরে মৃগয়ায় যাবেন আমরাও যাবো।

সেনাপতিদের কথা শুনে মনে মনে দুঃখিত হয় প্রতাপ। হয়তো সেনাপতিদের কথাই সত্য। সকলেই ধন্যকে ভালোবাসে। প্রতাপকে তারা চায়না। ধন্যকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলে যে কী ফল হতো ভগবান জানেন।

ফজল আলি দু জন সুন্দরী ইরানী নর্তকী নিয়ে ফিরে এসেছে। প্রতাপ খুব খুশী। কিছুদিন অন্ততঃ শান্তিতে এদের নাচ-গান উপভোগ করা যাবে। ফজল আলিও ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে যতবেশী সময় মহারাজকে তাদের মনজিলে আটকে রাখতে পারবে ততই বেশী পুরস্কার পাবে।

বয়স্যদের কাছে এসব ভালো লাগেনা। বয়স্য যযাতি বললো—মহারাজ, আপনাকে রাজকার্য্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা প্রয়াস সেনাপতিরা নিয়েছে, আপনি সাবধান না হলে বিপদে পড়বেন।

— যযাতি যারা আমার ভাইকে হত্যা করে আমাকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল তারা যে একদিন আমাকেও হত্যা করে কেউ সিংহাসনে বসবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই। সমস্ত সৈন্যবাহিনী তাদের হাতে। কিছুদিন ইরানী নর্তকীদের সান্নিধ্যে মনের অবসাদকে দূর করার চেষ্টা করছি। তারপর দেখবো সেনা-পতিরা আমাকে নিয়ে কী খেলা খেলতে চায়।

প্রতাপ জলসাঘরে যায়। ইরানী নর্তকীরা পেয়ালা ভরে মদিরা প্রতাপের হাতে তুলে দেয়। এক পেয়ালা শেষ হলে আর এক পেয়ালা। দুই ইরাণী নর্তকী পালা করে কেউ পেয়ালাতে মদিরা ঢালে, কেউ নাচ-গানে প্রতাপকে আকৃষ্ট

করে। প্রতাপ পেয়ালার পর পেয়ালা মদিরা খেয়ে নেশায় ঢুলতে ঢুলতে মেঝেতে গড়াগড়ি খায়। ইরাণী নর্ত্তকীরা যুবক মহারাজকে নিয়ে রঙ্গ করে।

মহারাজ বেরিয়ে গেলেই ফজল আলি আসে, আসে সিংহ নারায়ণ, প্রসেনজিৎ নারায়ণ প্রভৃতিরা। মোহরে মোহরে তাদের ওরনা ভরে যায়।

সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগ করে নিয়েছে। যার এলাকার শান্তি শৃংখলা সে সে বজায় রাখবে। যে সমস্ত উপঢৌকন পাওয়া যাবে তার অর্দ্ধেক রাজকোষে জমা হবে অর্দ্ধেক সেনাপতিরা নেবে।

চার মাস গত হয়েছে। দয়াময় দু'বার লোক পাঠিয়ে ধন্যকে সব খবর সরবরাহ করেছে। অভয় দিয়েছে। কিন্তু, ধন্যর মনে শান্তি নেই। সর্ব্বদাই অশান্তির আগুন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কর্ণমণি বুঝতে পারে না এত আরাম আয়েসে থেকেও কেন ঠাকুর মশায় খুশী নয়।

ধন্য প্রায়সই ভাবে কমলার কথা, রাজপুত্রদের কথা, রাজ্যের কথা। ছোট ভাই প্রতাপের রাজা হওয়ায় তার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই কিন্তু, ধন্য জানে প্রতাপের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ক্ষমতার লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়, পশু বানিয়ে দেয়। সেনাপতিরা এখন ক্ষমতার লোভে পশুর চাইতেও অধম হয়ে গেছে। প্রতাপ যে দিন সেনাপতিদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে সেদিনই তার মৃত্যু হবে। প্রতাপের জন্য দুঃখ হয় তার। প্রতাপকে রাজা বানিয়ে নিজেদের অভিষ্ট সিদ্ধির যে স্বপ্ন দেখেছে সেনাপতিরা তা সুযোগ এলে চূর্ণ করে দেবে সে।

দেখতে দেখতে ছ'টি মাস গত হয়ে যায়। ধন্যের কানে আসে এই ছ'মাসে প্রত্যেক সেনাপতি ও উজীর, নাজীরের দল নিজেদের ধনাগার স্ফীত করে ফেলেছে। প্রতাপ একবার

প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়েছে।

একদিন বিকেলে কর্ণমণিকে নিয়ে গোমতীর জলে নৌকায় বসে ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছিল। এমন সময় ছোট, আর একটি ছিপি নৌকা নিয়ে কর্ণমণির ছোট ভাই দশরথ এসে পৌঁছলো। অসময়ে ভাইকে এখানে একাকী আসতে দেখে অজ্ঞাত আশংকায় ভরে উঠলো কর্ণমণির মন। কর্ণমণি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মৃদু হেসে বললো— দাদা, অতিথিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য চন্তাই এর কাছ থেকে দূত এসেছে।

কর্ণমণি ভেবে পায়না এই কটি মাস একজন সাধারণ পুরোহিতের এভাবে গুপ্ত ভাবে থাকার কী দরকার ছিল? সে কি তবে রাজদরবারের কোন ব্যক্তির রক্ত চক্ষুর ভয়ে লুকিয়ে ছিল? নাকি বনবাসী ধন্যই ছদ্ম নামে এখানে বসবাস করে গেল?

ধন্য শুনে খুব খুশী হয়। চন্তাই এর বাড়ী থাকলে কমলাদের খবরা খবর রোজ পাওয়া যাবে। হয়তো দেখাও হতে পারে। রাজপ্রাসাদের শেষ খবর জানার জন্য ধন্যর মন উতলা হয়ে উঠে অথচ এখন কোন রূপ আগ্রহ প্রকাশ করা চলবেনা।

কর্ণমণিকে বললো, কর্ণভাই, তোমাদের বাড়ীতে ক'মাস থেকে যে আদর আপ্যায়ণ পেলাম তা জীবনে কখনো ভুলবোনা। যদি কোন দিন সুযোগ পাই তবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দিতে চেষ্টা করবো।

— ক্ষত্রিয়রা কখনো প্রতিদানের আশায় উপকার করেনা। ক্ষত্রিয়ের সামান্যতম ধর্ম পালন করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার আগামী দিন গুলো সাফল্যের স্বর্ণভাণ্ডারে ভরে উঠোক।

ছ'মাসে খুঁচা খুঁচা দাড়ি মুখের আদলকে বদলে দিয়েছে। ধন্যের গলার স্বরের সঙ্গে যারা একান্ত পরিচিত একমাত্র তারা

ছাড়া ধন্যকে কেউ চিনতে পারবেনা।

নৌকায় করে জল পথে গোমতীতে চলতে চলতে বিকেলে এসে পৌছলো চন্তাই এর বাড়ীর পাশে। ধন্যকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চন্তাই দু-জন সঙ্গীকে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছিল, নৌকা থেকে নামার পর তারা ধন্যকে চন্তাই এর বাড়ীতে নিয়ে গেলো।

ধন্য ভেবেছিলো ঘাটে কোন পরিচিত মুখের দেখা পাওয়া যাবে। একান্তে বসে কথা বলা যাবে কিন্তু, পরিচিত মুখের দেখা না পেয়ে কিছুটা বিমর্ষ হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলো। সাধারণ একজনকে এগিয়ে নিতে কোন রাজপুরুষ এগিয়ে এলে জন সাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই এ ব্যবস্থা।

দয়াময় ঠাকুরকে গিয়ে প্রণাম করলো ধন্য। দয়াময় ধন্যর মাথায় হাত রেখে বললো দীর্ঘজীবি হও। আজ তোমার পূর্ন বিশ্রাম কাল ভোরে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে। তোমার দু-এক বন্ধুরও দেখা পাবে। কিন্তু, সাবধান, কখনো স্ত্রী পুত্রকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করোনা তাহলে তোমার এবং তোমার স্ত্রী-পুত্রের জীবন বিপন্ন হবে।

একটা সু-সজ্জিত কক্ষ ধন্যকে ছেড়ে দেওয়া হলো। একজন দাসী এসে প্রণাম করে বললো – মান্যবর, আপানর হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে রেখেছি, আসুন, হাত-মুখ ধোয়ে বিশ্রাম নিন।

ধন্য হাত-মুখ ধোয়ে এসে সুন্দর সাদা বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলো। কয়েক ঘন্টা নৌকা যাত্রার অবসাদ দেহ থেকে মুছে ফেলতে চোখ বুজে শুয়ে রইলো। কিন্তু, কিছুক্ষণ পর নূপুরের মিষ্টি আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। দেখলো চন্তাই এর একমাত্র মেয়ে দেবযানী ঘরে ঢুকেছে। পাশে দু-জন সখীর একজনের হাতে পানীয় অন্য জনের হাতে বিভিন্ন জাতের ফল।

— আর্য, আপনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। দয়া করে উঠোন, খেয়ে নিন, শরীর ও মন দু'টোই ভালো লাগবে। কিছুপরেই সূর্য অস্ত যাবে। তখন ছাদের উপরে উঠলে গোমতীর মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসে আরো আরাম পাবেন।

ধন্য উঠে বসে, বলে,-তুমি কেন কষ্ট করতে গেলে? ওদের দিয়েই খাবার পাঠিয়ে দিলে হতো।

— আপনি আমাদের অতিথি। শুধু অতিথিই নন মহান অতিথি। আপনার সেবা আমার নিজেরই করা উচিত।

ধন্য উঠে প্রথমে একগ্লাস পানীয় গ্রহণ করলো তারপর ফল-মুল কিছু খেয়ে বললো - আমার মনে হয় আমি যেন আমার নিজ প্রাসাদেই আছি। কর্ণমণিদের বাড়ী ছ'মাস কাটিয়ে এলাম একদিনের জন্যও মনে হয়নি আমি পরবাসে অজ্ঞাতবাস করছি।

— কমলা দেবীর মতো তো কেউ যত্ন করতে পারবেনা। মায়ের মতোও কেউ স্নেহ করতে পারবেনা। এ দুটো জিনিষ থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত রয়েছেন। তবে যতটুকু খবর জানি ওরা সবাই ভালো আছেন, সুখে আছেন।

প্রতিদিন তিন বেলা খাবার দেওয়ার সময় দেবযানী আসে, ধন্যর খাওয়া শেষ হলে যায়। রাজপ্রাসাদে কোন রাণী এমন সুযোগ কমই পেয়ে থাকে। রাজনীতির আবর্তে পারিবারিক প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

— আর্য কী ভাবছেন ?

লজ্জিত হয় ধন্য। বলে — ভাবছি, তুমি আমার জন্য যে এত করছো সে ঋণ কী করে পরিশোধ করবো? আমার রাজ্যও নেই, ঐশ্বর্য্যও নেই, হতভাগ্য রাজপুত্র প্রাণ রক্ষার তাগিদে অজ্ঞাতবাস করছি।

—সুদিন একদিন আসবেই। আর সেদিন আগত প্রায়। শুনতে পাই আপনার ভ্রাতার সঙ্গে সেনাপতিদের মনোমালিন্য

শুরু হয়েছে! এটা বিরাট আকার ধারণ করলেই আপনার ভ্রাতার রাজত্বের অবসান হবে।

— আমরা তো তা চাইনি দেবযানী। স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা চলতে চেয়েছিলাম। সেনাপতিদের উদগ্র লালসার বলি হতে চলেছে আমার প্রিয় ছোট ভাই, আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব। চতুর্দ্দশ দেবতা নিশ্চয়ই আমায় সে সুযোগ এনে দেবেন। আর দেবযানী, আমি কথা দিলাম যদি আমার সুদিন ফিরে আসে আমি তোমাকে রাণীর বেশে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবো। অবশ্য যদি তোমার অমত না থাকে।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠে দেবযানী। তার প্রতিটি নারী সত্বা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল। বলে আর্য, আমি জানি রাজারা বহু বিবাহ করেন, রাজনৈতিক কারণেও বহু বিবাহ করতে হয়। বহু সতিনের ঘর করার মধ্যে কোন আনন্দ না থাকলেও রাণী হিসেবে কর্তব্য পালনের যে সামান্য সুযোগও পাওয়া যায় তা যদি কাজে লাগাতে পারা যায় তবেই জীবন সার্থক হয়। আমি কথা দিচ্ছি কমলাদেবীর পুত্র দেবকেই আমি ভবিষ্যত সন্তান এবং ভবিষ্যতের যুবরাজ ও পরে রাজা হিসেবে মেনে নেব।

— আমি জানি, চন্তাই এর মেয়ে হওয়ার সুবাদে সবরকম ত্যাগ তিতিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি তোমার আছে। আমার হাতের এই অঙ্গুট আমাদের প্রতিজ্ঞার স্মারক হিসেবে তোমার কাছে গচ্ছিত থাকুক। সময় এলে তোমাকে তোমার মর্যাদা দিয়ে আমি তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবো। — দেবযানীর মন আনন্দে ভরে উঠে।

চন্তাই দয়াময়ের বাড়ীতে ছোট খাট একটি সভা বসেছে। প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ, আচরংফা ও সিদ্ধিকুমার এবং চিন্তামণি উজীর উপস্থিত।

চিন্তামণি উজীরই প্রথমে শুরু করলো। বললো—

ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে ও সাধারণ প্রজা ও সর্দারদের মধ্যে এখন দ্বৈত ভাব দেখা দিয়েছে। দশজন সেনাপতি ত্রিপুরাকে দশটি সুবায় ভাগ করে দেশরক্ষা থেকে শুরু করে নজর আদায় পর্যন্ত সবকিছুই সেনাপতিদের মাধ্যমেই হচ্ছে। মহারাজের এটা পছন্দ নয়, আমাদেরও পছন্দ নয়। সেনাপতিরা শুধু দেশরক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখলে কোন ক্ষোভের কারণ ছিলনা। আমি উজীর পদে আছি সত্য কিন্তু, কোন সেনাপতিই আমাকে তোয়াক্কা করেনা। দশ সেনাপতি এক্ষেত্রে এক মত। কত টাকা রাজস্ব এক মাসে আদায় হয়েছে সে কথা জানাব সাহস আমার নেই। আমি জানি তাহলে আমার মাথা কাটা যাবে। মহারাজ নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন সুবা ভ্রমণ করতে মনস্থ করেছেন। তখনই গণ্ডগোলটা প্রকাশ্যে দেখা দেবে। মহারাজের অনুগত সৈন্যের সংখ্যা অতি সামান্য। আমি জানি মহারাজ অতি শীঘ্রই বিপদ ডেকে আনছেন।

ধন্য এক মনে উজীরের কথা শুনে বলে — উজীর মশায় একজন রাজা নিজের দেশের জন্য জীবন বলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। আর যে রাজা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রয়াসী না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক। সেনাপতিরা প্রাপ্য রাজস্ব কোষাগারে জমা না দিয়ে অন্যায় করছে। অন্যায়কে মেনে নিয়ে কোন রাজাই দীর্ঘদিন রাজত্ব চালাতে পারে না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে মহারাজ ঠিক কাজই করেছেন।

দৈত্যনারায়ণ বললো — উজীর মশায়, কখনো কখনো ক্ষমতাবান ব্যক্তিদেরও কালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় ইচ্ছামৃত্যু মহাবীর ভীস্ম, অজেয় দ্রোন, অশ্বত্থামা, মহারথী কৃপাচার্য প্রভৃতির মতো মহা মহারথীগণ উপস্থিত ছিলেন। এদের যে কোন একজন বিরোধীতা করলেই কিংবা প্রতিবাদ করলেই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মতো সর্বকালের লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটতো না। কিন্তু, তবু ঘটলো। ঐ সব

মহাবীরেরা সেদিন চুপ করে না থাকলে কৌরবদের ধ্বংসের পথ প্রশস্থ হতোনা। প্রধান সেনাপতি হিসেবে আমার উচিত ছিল অন্য সেনাপতিদের নিরস্ত করা কিন্তু, আমি জানি ক্ষমতালাভের জন্য ওদের এত বেশী লোভ জেগেছিলো যে বাঁধা দিতে গেলে বিরাট গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতো। কয়েকমাসের ব্যবধানেই দেখছি ওদের ক্ষমতার বেলুন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। বর্তমান মহারাজও সেনাপতিদের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে সাধারণ প্রজার উপর ঝাল মেটাতে চাইছেন। আমি চেষ্টা করবো যাতে বিনারক্তপাতেই প্রকৃত দাবীদারের হাতে রাজ্যের ভার ন্যস্ত করা যায়। না হলে সেটা কালের অমোঘ গতির কাছে আমার পরাজয় বলে ধরে নিতে হবে।

দয়াময় বললো – উপস্থিত মান্য ব্যক্তিগণ, আজকের সভার কথা যাতে আমরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ না জানতে পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি মুহুর্তে রাজ্যে কোথায় কি ঘটছে এবং কী আকার ধারণ করছে সে বিষয়ে আপনাদের অবহিত হতে হবে। যুবরাজ আমার প্রাসাদে আছে এ কথাও যেন কেউ না জানতে পারে। কমলাদেবীকেও জানাবেন না। শাস্ত্রে আছে কোন গোপণ কথা মেয়েরা হজম করতে পারেনা। খবর পেলেই স্বামীকে দেখার উদগ্র বাসনা জাগবে এবং এখানে ছুটে আসবে। আর সিংহ নারায়ণরা যদি জানতে পারে সে এখানে আছে তা হলে পথের কাঁটা ভেবে নিয়ে ওকে বধ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেনা।

কয়েকজন দাসী খাবার থালায় বিভিন্ন ধরণের খাবার নিয়ে হাজির হলো। এক একটি থালা এক এক জনের সামনে রাখা হলো। রূপোর গ্লাসে করে ঝরণার জল ঢেলে দেওয়া হলো। দয়াময় বললো — মহামান্য অতিথিগণ, আপনারা ভোজন শুরু করুন।

সেনাপতি সিংহনারায়ণ আর প্রসেনজিৎ নারায়ণই সেনাপতিদলের অধিনায়ক। অন্যান্য সেনাপতিগণ ওদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করেনা।

রাজসভা বসেছে অমাত্য ও সেনাপতিগণ সকলেই যার যার আসনে বসে আছেন। ঘোষক ঘোষণা করলো মহারাজাধীরাজ, বিক্রম কেশরী শ্রী শ্রী প্রতাপ মাণিক্য বাহাদুর আসছেন, আপনারা সাবধান হউন .....।

সভায় উপস্থিত অমাত্যগণ মুহুর্তের জন্য আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আবার মহারাজ বসার আগেই স্ব-স্ব আসনে বসে পড়লো। বিরক্ত হলো মহারাজ। সিংহাসনে বসে মহারাজ বললো— প্রধান সেনাপতি মশায়, আমি আগামীকাল ভোরে বীরগঞ্জ যাত্রা করবো, আপনি আমার যাত্রার আয়োজন করুন

— মহারাজ, সেখানে বিশেষ কোন কাজ আছে কি ?

— প্রায় দশ মাস হয়ে গেলো আমি সিংহাসনে বসেছি এই দশমাসে কোন প্রজার সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি। আমি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রজাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই, ওদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে চাই।

সিংহনারায়ণ বললো— মহারাজ, অমাত্যগণ মহারাজের বিভিন্ন অঙ্গ। কেউ মস্তিষ্ক, কেউ হাত, কেউ পা, কেউ চোখ। আপনার পরিশ্রমের কী প্রয়োজন ? আপনার কাছে কি কোন নালিশ এসেছে ? আপনি কি আমাদের উপর ভরসা রাখতে পারেন না ? আমরা ভেবেছি আপনার রাজ্য প্রাপ্তির এক বৎসর পর খুব ঘটা করে রাজ্য প্রাপ্তির উৎসব পালন করবো। সব অঞ্চলের সর্দারদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, আপনি পরিচয়ের সুযোগ পাবেন।

— আপনারা এক বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান করতে চান করুন, আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু, রাজা হয়ে আমি রাজ্য ঘুরে দেখতে পারবোনা এ কেমন কথা ?

সিংহ নারায়ণ বললো— মহারাজ, আমি রাজ্যের পরি—স্থিতির কথা চিন্তা করেই আপনাকে নিরস্ত করতে চাইছি, আপনার ভুলে গেলে চলবেনা আপনি আপনার জেষ্ঠ্য ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে রাজ সিংহাসন দখল করেছেন। ত্রিপুরার প্রজাগণ আপনাকে ধন্য'র অপেক্ষা কমই দেখেছে, তবুও আপনি যদি ভ্রমনে বের হতে চান, আপনার যদি আমাদের কথা শুনতে খারাপ লাগে, আমাদের কথায় সন্দেহ জাগে আপনার খুশী মতো আপনি চলতে থাকুন আমরা আপনার হিতাকাঙ্খী সেনাপতিরা পক্ষে থাকবো না।

— যে রাজসিংহাসনে বসে নিজের পছন্দ মতো কাজ করা যায়না সে রাজসিংহাসনের কী প্রয়োজন? আমি কাল বীরগঞ্জ যাচ্ছি, যাত্রার সকল আয়োজন করুন।

— যথা আজ্ঞা মহারাজ।

— ঠিক্ হলো মহারাজ যাবেন গোমতীর জলপথ ধরে বজরায় কিছু বিশ্বস্ত সেনা সঙ্গে যাবে আর বাকী সৈন্যরা যাবে পাঁয়ে হেটে দেবতা মুড়ার উপর দিয়ে।

পাঁচটি সু-সজ্জিত বজরায় মহারাজ ও রাজপুরুষগণ বীরগঞ্জের দিকে যাত্রা করলো। ঠিক্ হলো কর্ণমনি রিয়াং এর বাড়ীর পাশে যে বিরাট টিলা রয়েছে সেখানে ছাউনি ফেলা হবে।

মহারাজ আসছেন শুনে নগরাই, অম্পি, তৈছু সোনাছড়া প্রভৃতি গ্রামের সর্দারগণ আগে থেকেই কর্ণমনির বাড়ীর পাশের মাঠে এসে হাজির হয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের খাবারের পসরা, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। স্থানীয় সর্দারদের মিলিত প্রচেষ্টায় মহারাজ ও সঙ্গের পাঁচ হাজার সৈন্য সামন্তের খাবার দাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্ষাণিক পর পর শূকরের আর্ত্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ব্যথিত হয়ে উঠ্ছে। শুকনো লাকড়ীর পাহাড় জমা করা হয়েছে।

দশ জায়গায় আগুন জ্বেলে তুটো কাঠের খুটিতে কাঁচা মুলিবাঁশে শূকরের দেহ গেঁথে নীচে আগুন জ্বেলে ঝলসানো হচ্ছে। পাহাড়ী সর্দারদের অনেকেই মদের নেশায় চুড় হয়ে আছে।

বেলা তুটোয় মহারাজের নৌকা এসে পৌছলো রাঙ্গামাটির ঘাটে। সেখান থেকে রামপুর চার ক্রোশ হবে। নদীর ঘাটে মহারাজের জন্য সু-সজ্জিত হাতী অপেক্ষা করছে। কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যও মহারাজের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মহারাজ বজরা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের জয়ধ্বনিতে নদীর ঘাট মুখরিত হয়ে উঠলো। মহারাজ হাওদায় চড়ে বসলে সু-সজ্জিত হাতী মহারাজকে নিয়ে গন্তব্য স্থানে এগিয়ে চললো।

মহারাজ পৌছনোর কিছুক্ষণ পরই মহারাজের স্থলপথের সেনাপতিও সৈন্যগণ এসে হাজির হলো। শরতের মেঘ-মেতুর আকাশের নীচে শুরু হলো খাবারের পালা।

সু-সজ্জিত তাবুতে মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে ইরানী নর্তকীও এসেছে মহারাজের মনোরঞ্জনের জন্য। অন্য একটি সু-সজ্জিত তাঁবুতে রাজ পরিবারের কয়েকজন কুল বধূ এবং মহারাণীও রয়েছেন আর ইরাণী নর্তকী এবং তার সখীরা রয়েছে ভিন্ন এক সু-সজ্জিত তাঁবুতে।

বিকেলের ভুরি ভোজনের পর সকলেই যার যার তাবুতে কিছুক্ষণের জন্য আলস্যে ডাগা এলিয়ে দিয়েছে। যারা কাজ করছে শুধু তারাই নিরলস ভাবে তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছে। আশে পাশের গ্রামের নেড়ি কুকুরের দল ভুরি ভোজনের গন্ধে এখানে এসে খাবারের জন্য স্ব-গোষ্ঠির সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে আর সেই সংগ্রামের উৎকট শব্দে সচকিত হয়ে নেশায় জড়িত কোন রাজ পুরুষ কুকুরদের বাপের শ্রাদ্ধ করছে।

সন্ধ্যার পর হাজারো মশালের আলোতে টিলা ভূমি

আলোকিত। একটি সুদৃশ্য বাঁশের মঞ্চ তৈরী করে নাচ গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহারাজ ঘোষণা করেছেন নাচের আসরে যে সম্প্রদায়ের মহিলারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে মহারাজ সে দলকে পুরস্কৃত করবেন।

একে একে রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মহিলা দল তাদের স্ব-স্ব নাচ গানের মহড়া প্রদর্শন করলো। মহারাজ রিয়াং মহিলা দলকে শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে প্রত্যেক শিল্পীকে দশটি করে টাকা এবং দলপতিকে একটি সোনার হার উপহার দিলেন। তা ছাড়া যোগদানকারী প্রত্যেক দলকেই তিনি বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। আসর শেষ হলো।

মহারাজের নিজের তাবুতে ফিরে এলেন। কয়েকজন বয়স্য মহারাজের সঙ্গে বসে রসালাপ শুরু করলো। মহারাজ কখনো কখনো তাদের হাসির সঙ্গে হাসি মেলাচ্ছেন, কখনো নেশার ঘোরে ঢলে পড়ছেন।

রাত হয়েছে, বাইরে কোলাহল রয়েছে। আগত সৈন্য ও স্থানীয় অধিবাসীরা এখনো খাওয়া দাওয়া করছে। মহারাজ এক বয়স্যকে বললেন - ইরাণী নর্তকীকে পাঠিয়ে দিতে। বয়স্য নমস্কার জানিয়ে নর্তকীর তাবুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নর্তকী তার দলবল সহ হাজির হয়ে মহারাজকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। মহারাজ বললেন—এই তেপান্তরের মাঠে তোমার স্যাক্রেদদের তাল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বাজনা ছাড়া শুধু নিজের তালে তালে নেচে আমাকে খুশী করো।

নর্তকী ও স্যাক্রেদরা এর অর্থ জানে। এসব তাদের গা সহা। বাদকের দল মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলো। শুরু হলো ইরাণী নর্তকীর নূপুরের রিনিঝিনি আওয়াজ। ক্ষণিক পর সে আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেলো।

মহারাজের ঘুম ভেঙ্গেছে, চোখ মেলে দেখলেন নর্তকী

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা করছে। মহারাজ তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন প্রকৃতির পরিবেশ আকাশকে কতো সুন্দর দেখায়! পূবের কালাঝারিকে মনে হলো দেবতাত্মা হিমালয়! যে তুষারধবল হিমালয় দেখেনি, তাকে কালাঝারি দেখেই হিমালয় দেখার স্বপ্ন স্বার্থক করতে হবে। যে গঙ্গা দেখেনি তাকে গোমতী দেখেই তৃপ্ত হতে হবে। যে দিল্লী দেখেনি তাকে রাঙ্গামাটি দেখেই চোখের অভিলাস পূর্ণ করতে হবে।

একজন সেবক একটি চেয়ার এগিয়ে দিল। মহারাজ বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাণী সখীদের নিয়ে মহারাজের সামনে হাজির হয়ে অভিভাদন জানিয়ে বললেন—মহারাজের জয় হউক, কাল মহারাজের সুনিদ্রা হয়েছিল তো?

মহারাণীর কথায় মহারাজ কিছুটা লজ্জিত হলেন। কাল সারারাতে তিনি ইরাণী নর্তকীর উষ্ণ সান্নিধ্যে রাত যাপন করেছেন।

মহারাণী মৃদু হেসে বললেন—মহারাজের প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়ে থাকলে মহারাজের জন্য প্রাতঃরাশ পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

মহারাজ প্রাতঃকৃত্য শেষ করে যখন প্রাঃতরাশ করছেন এমন সময় স্থানীয় সর্দার এসে মহারাজকে অভিভাদন জানিয়ে বললো—মহারাজ, অভয় দিলে একটা নিবেদন রাখতে পারি।

—বলো।

—মহারাজ, গতকাল নাচগানের পর আমাদের দলের একটি মেয়েকে সেনাপতি যুদ্ধনারায়ণ বল পূর্বক ধর্ষণ করেছে। আজ ভোরে মেয়েটিকে সৈন্য দিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়ের অপমান আমাদের গ্রামের অপমান আর আমাদের অপমান মহারাজেরও অপমান। সেনাপতি যুদ্ধ-নারায়ণ আরও বহুবার বহু মেয়েকে বল পূর্বক ধর্ষণ করেছে।

আপনার কাছে যাবার সাহস আমাদের হয়নি, ন্যায় বিচার পাব কিনা তাও সংশয় ছিল। এখন মহারাজ সু-বিচার করলে আমাদের গ্রামবাসী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—মেয়েটি বিবাহিতা?

—না মহারাজ, একটি ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল, সে আপনার সেনাবাহিনীতে চাকুরী করে।

—মেয়েটিকে নিয়ে আসুন।

মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠেন মহারাজ। গতকাল রাতে এই মেয়েটিকেই সোনার হার উপহার দিয়েছিলেন। সারারাতের জাগরণে আর অত্যাচারে মেয়েটির চোখের কোনে কালি জমেছে। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বিচার প্রার্থনা কর?

—মহারাজ, আমি চাই ধর্ষণ কারীর কঠিন শাস্তি হউক। আমার প্রণয়ী আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, সে যখন আমার অপমানের কথা শুনবে তখন নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। একজন সেনাপতি হয়ে সাধারণ একজন সৈনিকের ভাবী বধূকে জেনে শুনেও যে ধর্ষণ করতে পারে সেই দুঃশ্চরিত্র লোক কখনো সেনা নায়ক হতে পারে না।

—তুমি ঠিক্ই বলেছ, এর জন্য যুদ্ধনারায়ণকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করবো। আর কোন সেনাপতি যাতে নারীর উপর অত্যাচার না করতে পারে তা দেখব। এবার খুশী তো?

—মহারাজ দীর্ঘজীবি হউন। আপনার আশ্বাসে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হয়েছে। আমি চলি।

কিছুক্ষণ পর আদিবাসী সর্দারগণ মহারাজকে দর্শন করতে এসে ভেট্ দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছে। সর্দারগণ জেনেছে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ধন্য সংসার বিরাগী হয়ে স্বেচ্ছায় বন গমন করেছে। ধন্যে'র প্রতি সকল প্রজার আকণ্ঠ সহানুভূতি। প্রতাপের প্রতিও বিদ্বেষ নেই। তবুও সিংহাসন

প্রাপ্তির কয়েক মাস গত হলেও প্রজাদের সঙ্গে মিলিত না হওয়ায় কিছু কিছু সর্দার বিরক্ত।

রামপুরের আদিবাসী সর্দারদের সঙ্গে মিলিতভাবে মহারাজ কালাঝারিতে গেলো শিকার করতে। কালাঝারি বন্য পশুদের অবাধ মুক্তাঞ্চল। মহারাজ নিজের হাতে কয়েকটি শুকর ও দুটো হরিণ শিকার করলেন। শিকারে বেরিয়ে শ'খানিক শুকর, পঁচিশটা হরিণ ও দুটো বাঘ মারা হলো। শিকারে যা পাওয়া গেল তা দিয়েই রাতের উৎসব পালিত হলো।

সাতদিন বীরগঞ্জ কাটিয়ে মহারাজ ফিরে এলেন রাঙ্গামাটিতে। মহারাজ ও অমাত্যগণ রাজধানীতে না থাকায় রাজধানী যেন ঘুমন্ত নগরীতে পরিণত হয়েছিল আবার মহারাজের প্রত্যাবর্তনের পর ঘুমন্তনগরী জেগে উঠলো।

চন্তাই এর বাড়ী বসে সব খবরই পায় ধন্য। প্রধান সেনাপতি এসেছিল চন্তাই-এর বাড়ী। জামাতাকে দেখে গেছে এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে গেছে।

রামপুর থেকে কয়েকজন সর্দার এসেছে সেনাপতি যুদ্ধনারায়ণের বিরুদ্ধে মহারাজ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা দেখার জন্য।

সাতদিন পর আবার রাজসভা বসেছে। সেনাপতি ও অমাত্যগণও উপস্থিত। মহারাজ সিংহাসনে বসে উপস্থিত অমাত্যবর্গ ও সেনাপতিদের উদ্দেশ্য করে বললেন— উপস্থিত সভাসদগণ, যদি রক্ষক হয়ে কেউ ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?

অমাত্য দুর্জয় ঠাকুর বললো — মহারাজ, তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা করা উচিত।

— আমাদের সেনাপতি যুদ্ধনারায়ণ, রামপুর গিয়ে আমার দ্বারা পুরস্কৃত একটি যুবতী মেয়েকে বল পূর্বক ধর্ষণ করেছে এ সংবাদ আপনারা শুনেছেন?

'সিংহ নারায়ণ বললো— মহারাজ, সামান্য একটি মেয়ের শ্লীলতা হানির জন্য একজন সেনাপতিকে সভার মাঝে অপমান করা অনুচিত। এতে সৈন্যরা সেনাপতির প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। আপনি সভার বাইরে এর মিমাংসা করুন।

— একজন সেনানায়ক যদি চরিত্রহীন হয় তবে তার অধীনস্থ সৈন্যরা কেমন আচরণ করবে ?

— মহারাজ, সামান্য একটা ঘটনার জন্য একজন বীর সেনাপতিকে চরিত্রহীন বলা চলেনা। দেশের স্বাধীনতা এবং মান রক্ষার্থে যারা জীবন উৎসর্গ করছেন তাদের প্রতি দেশবাসীরও কিছুটা করণীয় আছে।

— আপনাদের ভয়ে সাধারণ প্রজা এমনকি সর্দারগণও আমার কাছে নালিশ জানাতে সাহস পায় না। আপনারা নিজেরা ভাল না হয়ে দেশবাসীর কখনো মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না। আমি মনে করি রক্ষক হয়ে যারা ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে তাদের শাসন ক্ষমতায় থাকার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আমি যুদ্ধনারায়ণকে সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দিতে চাই।

মহারাজের কথা শোনা মাত্র সভায় যেন বাজ পড়ার মতো সেনাপতিদের ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হলো। প্রধান সেনাপতি মনে মনে ভাবলেন— এবার প্রতাপের রাজত্বের অবসান হতে চললো। মনে মনে খুশী হলো সে। তবুও বললো —মহারাজ, সেনাপতিদের মনোভাব বিচার করে আপনার বিচারের রায় দেবেন। অন্যথায় অনর্থ হতে পারে।

— প্রধান সেনাপতি মশায়, আপনি ও কি অন্যায়কে মেনে নিতে বলেন ?

— আমি শুধু মহারাজকে পরিস্থিতি বিচার করে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

— আমি অমরপুরের সর্দারদের কথা দিয়ে এসেছি

রাজধানীতে ফিরেই এর বিচার করবো।

— মহারাজ ইচ্ছে করলে বিচারের দিন ক্ষণ পিছিয়ে দিতে পারেন। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

— অমাত্যগণ, আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল। যুদ্ধনারায়ণকে শাস্তি পেতেই হবে। আমি তাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করলাম।

যুদ্ধনারায়ণ তরবারী কোষ মুক্ত করে ক্রুদ্ধ গর্জন করে এগিয়ে গেলো সিংহাসনের দিকে। সভাসদগণ এবং সকল সেনাপতিরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা। মহারাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক এগিয়ে এলো যুদ্ধনারায়ণকে বাঁধা দিতে। মুহূর্তের মধ্যে এক অকল্পনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে রাজসভা অসির ঝন্ ঝনায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। সেনাপতি সিংহনারায়ণ সমস্ত সেনাপতিদের উদ্দেশ্য করে বললো —বন্ধুগণ, যুদ্ধ নারায়ণ এভাবে হত হলে আমাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আসুন সকলে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধনারায়ণকে রক্ষার চেষ্টা করি।

প্রতাপ মাণিক্য এবং সভাসদ এহেন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলন।। অমরপুরে মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একথা সভাই জানে। সকলেই ভেবেছিল মহারাজের এটা কৌশল মাত্র।

মহারাজের দেহরক্ষীর একটা অংশ এগিযে গেলো অন্য অংশ সেনাপতিদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট রইলো। মহারাজ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই তিনি পেছনের দরজা দিয়ে রাজসভা থেকে পালাতে গিয়ে দেখলেন স্বয়ং সেনাপতি সিংহনারায়ণ সেখানে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—সেনাপতি মশায়, আপনারা শান্ত হউন, আমার আদেশ আমি পুনর্বিবেচনা করবো।

- সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে মহারাজ। এরপর আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না। আপনার জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি।

সিংহনারায়ণ তরবারী তুলে আঘাত করার আগেই মহারাজ তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিংহনারায়ণের উপর। সিংহনারায়ণ অভিজ্ঞ সেনাপতি। মুহূর্তে নিজেকে প্রতাপের আক্রমণ থেকে সরিয়ে নিয়ে উল্টো আঘাত করলো। প্রতাপমাণিক্য আর সেনাপতির মধ্যে অসি যুদ্ধ চলছে। এমন সময় পেছন থেকে সমরনারায়ণ এসে মহারাজের গলায় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের মাথা ঘার থেকে ছিটকে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়লো। ফিনকি দিয়ে মাথাহীন দেহ থেকে রক্ত ছুটলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজসভা জনশূন্য।

বাতাসের আগেই যেন রাজধানীর সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। প্রতাপ মহিষী খবর পেয়ে একজন বিশ্বস্ত সখীকে নিয়ে সাধারণ পরিচারিকার বেশে রাজপুরী থেকে বের হয়ে গেলো। ধন্য ভাই-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রতিজ্ঞা করলো যে করেই হউক ভ্রাতৃ হত্যাদেরও পশুর মতো বধ করবে।

পাশাপাশি ধন্য ভাবলো, প্রধান সেনাপতি ও দুএকজন ছাড়া তার কথা কেউ জানেনা। অন্য সবাই ধরে নেবে ধন্য নিখোঁজ। তাই সেনাপতিদের মধ্যে যদি কেউ রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখে? অথবা অন্য কোন রাজ পুরুষকে যদি সিংহাসনে বসায়? অথবা সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য যদি তাকেও খোঁজে হত্যা করে? এখানে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবেনা। সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে ধন্য। চন্তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, সেরকম কিছু হলে প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ সময় থাকতেই তাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সন্ধ্যায় দৈত্যনারায়ণের বাড়ীতে সেনাপতিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিংহনারায়ণ বললো - সেনাপতিগণ এই মুহূর্তে

রাজপ্রাসাদে কোন যোগ্য উত্তরসূরী নেই। আমাদের মধ্যেই আপাততঃ কেউ সিংহাসনে বসে উত্তর সুরীর খোঁজ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাজ্য পরিচলনা করুক।

দৈত্যনারায়ণ বললো – প্রস্তাবটা খারাপ নয়, কিন্তু, কে বসবে সিংহাসনে ?

—অধিকাংশ যাকে সমর্থন করবে সেই সিংহাসনে বসবে।

—আমার মনে হয় সিংহাসনে বসার বাসনা আমাদের সকলের মধ্যেই রয়েছে। প্রধান সেনাপতি হিসেবে আমিও সে দাবী করতে পারি কিন্তু, তাহলে আমাদের মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তার চাইতে যদি ধন্যকে খোঁজে পাওয়া যায় তাকে সিংহাসনে বসালে আমাদের মধ্যে যেমন ক্ষমতার লড়াই বন্ধ হবে, রাজ্যেও কারো মনে কোন অসন্তোষ থাকবে না।

সমরনারায়ণ বললো—ধন্য যে প্রকৃতির সিংহাসনে তাকে বসালে প্রজারা হয়তো খুশী হবে কিন্তু, আমাদের কাউকেই ধন্য ক্ষমা করবেনা। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই। আমার মতে আমাদের মধ্যে থেকেই কাউকে মনোনয়ন করা হউক।

দৈত্যনারায়ণ বললো— আমরা শুধু যুদ্ধ করে রাজ্যকে রক্ষা করতে পারদর্শী। শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে উজীর, নাজির প্রভৃতিদের যোগ বেশী। ওরা যুদ্ধ এবং শাসন দু:টা ব্যাপারেই অভিজ্ঞ, কাল রাজসভায় সকল সভাসদ মিলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

সিংহ নারায়ণ চাইছিল কোন সেনাপতি তাকেই সিংহাসনে বসার প্রস্তাব রাখুক কিন্তু, কারও কাছ থেকে কোন প্রস্তাব না আসায় ভাবলো – প্রতাপ মাণিক্যকে বধ না করাই ভলো ছিলো। প্রতাপ মাণিক্যের সঙ্গে সন্ধি করলে ভবিষ্যতে প্রতাপ তাদের সমীহ করে চলতো। সে নিজে যদি প্রতাপের পথ রোধ না করতো তা হলে এই ভয়ানক পরিনতি থেকে রাজ্য রক্ষা

পেতো। দৈত্যনারায়ণ কখনো চাইবেনা সেনাপতিদের মধ্যে কেউ রাজা হউক। বরং ধন্যকে সিংহাসনে বসাতে পারলে নিজের পদটা বহাল থাকবে।

দ্বিধাগ্রস্ত সেনাপতিরা কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারলো না। ঠিক্ হলো পরদিন রাজসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রাজা নেই, রাজসিংহাসন শূন্য। তবু-ও উত্তরাধীকারী মনোনয়নের জন্য সকলেই সমবেত হলো। সকলেই ক্ষেদ প্রকাশ করলো যে যদি ধন্যকে এই দুঃসময়ে পাওয়া যেত তাহলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

দৈত্যনারায়ণ বললো — ধন্যকে খোঁজলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে সিংহাসনে বসতে চাইবে কিনা তা কে বলতে পারে? উজীর চিন্তামণি বললো - ধন্যকে পাওয়া গেলে আমরা তাকে রাজী করাবই। আপনাদের মধ্যে কেউ কি তার খোঁজ দিতে পারেন?

— শুনেছি চন্তাই তার খবর জানেন। চন্তাই-ই পারেন তাকে রাজী করিয়ে সংসারে ফিরিয়ে আনতে, আপনারা রাজী হলে চন্তাই এর কাছে চলুন।

কয়েকজন সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ আসছে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন চন্তাই। চন্তাই ধন্যকে বললেন শীগ্গীর ঠাকুরের খাটের নীচে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। যদি তাদের উদ্দেশ্য মন্দ হয় তোমার বিপদ ঘটতে পারে।

ধন্য নিজের জীবনের জন্য যতটা ব্যাকুল তার চাইতেও ব্যাকুল হলো ত্রিপুরার ভবিষ্যতের জন্য। মনে মনে ভাবলো হয়তো এখন থেকেই ত্রিপুরার সিংহাসনে অন্য বংশের বংশধরগণ বসতে শুরু করবে। প্রতাপের হত্যার প্রতিশোধ আর নেওয়া হলো না। খাটের নীচে সটান শুয়ে পড়ে চতুর্দ্দশ দেবতাকে স্মরণ করতে লাগলো।

চন্তাই বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করে যখন নিশ্চিত হলো যে ধন্যকে সিংহাসনে বসানোর জন্যই এরা এসেছে তখন চন্তাই নিজে গিয়ে ধন্য মাণিক্যকে ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের শোবার খাটের নীচে থেকে বের করে আনলেন। ধন্য চন্তাই এর পা ধরে মিনতি করে বললো—ঠাকুর, আপনি কিন্তু আমার জীবন বিপন্ন করবেন না। তারা যদি কথায় ভুলিয়ে আমার সন্ধান জেনে নিয়ে আমাকে হত্যা করে তখন আমার প্রতাপের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পথ থাকবেনা।

— আমি নিশ্চিত হয়েই তোমাকে নিতে এসেছি। বৎস, এখন তুমি বিন্দুমাত্রও উত্তেজনা প্রকাশ করবেনা। প্রথমে তুমি সিংহাসন গ্রহণে আপত্তি জানাবে। এক কথায় রাজী হয়ে গেলে সিংহনারায়ণদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

প্রায় দশ মাস পর সেনাপতিদের সঙ্গে ধন্য'র সাক্ষাৎ হলো। একাধিক সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে পিতা ধর্ম মাণিক্যের রাজত্বে দু-একবার ছোট খাট সংগ্রাম পরিচালনাও করেছে। সেনাপতিদের ধারণা ধন্য সিংহাসনে বসলে তাদের আধিপত্য বজায় থাকবেনা। অথচ দৈত্যনারায়ণ জীবিত থাকা পর্যন্ত তাকে সিংহাসনে না বসিয়ে উপায় নেই। দৈত্যনারায়ণকে সিংহাসনে বসানোর চেয়ে ধন্যকে সিংহাসনে বসানো অনেক নিরাপদ।

ধন্য সেনাপতিদের দিকে হাতজোর করে বললো—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। যে ক্ষমতা ত্যাগ করেছি তা গ্রহণ করে ঈশ্বরের রাজ্যে অপরাধী সাজতে চাইনা। আপনাদের মধ্যে কেউ সিংহাসনে বসুন নয়তো কাকার কোন ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিন। আমি বাকী জীবন ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দিতে চাই।

সিংহনারায়ণ একবার ধন্যকে ভালো করে দেখলো। ধন্য'র কথায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা প্রকাশ পেলোনা। দৈত্যনারায়ণ

বললো -আমরা তোমাকেই সিংহাসনে বসাতে চাই ধন্য। তুমি রাজি না হলে রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেবে। সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। তোমার পিতার এত সাধের রাজত্ব টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে।

আপনারা অন্য কাউকে সিংহাসনে বসান। আমি আর সংসারের যাতাকলে প্রবেশ করতে চাইনা। ঠাকুর মশায় এর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য আমি এসেছিলাম। ভাগ্যের কি পরিহাস! আমার উপস্থিতির পর রাজ্যে শূণ্যতার সৃষ্টি হলো।

সিংহনারায়ণ বললো - যুবরাজ, আমরা আপনাকেই সিংহাসনে বসাতে চাই। আপনি অমত করবেন না। আমরা সব ব্যাপারে আপনাকে সহযোগীতা করবো। আপনার শ্বশুর মশায় স্বয়ং প্রধান সেনাপতি, আপনার ভাববার কী আছে?

কমলা শুনেছে তার স্বামী চন্তাই এর বাড়ী আছে। শুনা মাত্রই সখীদের নিয়ে হাজির হলো কমলা। আচংরফা বললো যুবরাজ, কমলা দেবী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। আপনি অনুমতি করলে তিনি আসতে পারেন।

ধন্য বললো—সেনাপতি মশায়, আমি এখন একজন সন্ন্যাসী মাত্র। সেনাপতিগণ এখানে এক জরুরী পরামর্শে ব্যস্ত। এ অবস্থায় কোন রাজমহিষীর এখানে উপস্থিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবুও প্রধান সেনাপতি যদি আদেশ করেন তাহলে আসতে পারেন। আমার এখানে কোন কিছু বলার অধিকার নেই।

দৈত্যনারায়ণ বললো - যুবরাজ ঠিক কথাই বলেছেন। আমরা এক সংকটজনক অবস্থায় এখানে মিলিত হয়েছি। সংকট মোচন সর্বাগ্রে দরকার। মহিষীকে বলে দিন যুবরাজকে আমরা যে কোন প্রকারেই রাজী করিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবো।

রাজপ্রাসাদেই কমলাদেবীর সঙ্গে যুবরাজের সাক্ষাৎ হবে।

কমলা বুদ্ধিমতী তাই রাজি হলেও দুঃখকে মনে স্থান দিলো না। আচরংফাকে বললো - আপনাদের যুবরাজকে বলবেন কমলাদেবী বাইরে থেকেই যুবরাজকে এবং প্রণম্য ব্যক্তিদের প্রণাম জানিয়ে গেছেন। তারা যেন কমলাদেবীর অপরাধ ক্ষমা করেন।

পত্নীর উত্তরে মনে মনে খুশী হয় ধন্য। সেনাপতি দৈত্য-নারায়ণকে বলে, সিংহাসনে আরোহন করতে আমার আপত্তি নেই। আপনারা যদি আমার হয়ে সমগ্র রাজ্যে আমার প্রতিনিধিরূপে শাসন কাজ চালাতে অঙ্গীকার করেন তাহলেই আমি রাজপ্রাসাদে যেতে রাজী।

যুবরাজের কথায় সব সেনাপতিই দারুণ খুশী হয়। সকলেই সমস্বরে বলে, যুবরাজ, আমরা আপনাকে সহযোগীতা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো। এবার অনুগ্রহ করে চলুন। আগামী কালই যাতে আপনার অভিষেক সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করতে বলি।

রাজধানী রাঙ্গামাটিতে আবার আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গেলো। প্রজাদের প্রিয় যুবরাজ রাজধানীতে ফিরে এসেছে এবং সিংহাসনে বসতে রাজী হয়েছে এ কথা বাতাসের আগেই রাজ-ধানীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো।

মহা ধুমধাম করে যুবরাজের রাজ্যাভিষেক পালিত হলো। চন্তাই দুহিতা দেবযানী চতুর্দ্দশ দেবতার নির্মাল্য নিয়ে এলো সাঁঝিতে করে। আগে আগে এলো চন্তাই স্বয়ং।

চন্তাইকে দেখে ধন্যমাণিক্য সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে চন্তাইকে অভিভাদন জানালো। ধন্যমাণিক্যকে আশির্বাদ করে চন্তাই বললেন—তোমার রাজত্বে প্রজাগণ সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করুন চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট এই প্রার্থনা করি।

দেবযানী একটি সুন্দর ফুলের মালা উপহার দিয়ে মহারাজকে অনুচ্চস্বরে বললো - চন্তাই এর মেয়ের সামান্য উপহার। এই ফুলের গন্ধে যেমন রাজসভা আমোদিত হয়েছে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি মহারাজের যশোগাঁথায় এমনি করে আমোদিত হউক।

—মহাদেবীর কথা মনে থাকবে।

চাই, দুহিতাসহ সভা ত্যাগ করলে মহারাজ সভাসদকে উদ্দেশ্য করে বললো—সভাসদগণ, রাজ্য রাজনীতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা রাজ্যের প্রয়োজনেই ভুলে যেতে হয়। আমার অবর্ত্তমানে আমার ভাই প্রতাপ সিংহাসনে বসেছিল, রাজনীতির প্রভাবেই তার রাজত্বের অবসান ঘটেছে। এমন বহু ঘটনাই ঘটে, তবুও ভুলে যেতে হয়। আমিও এ ঘটনাকে আকস্মিক এবং অনাকাঙ্খিত বলে মনে করেছি। আপনারাও ঐ ঘটনাকে ভুলে গিয়ে আপনাদের পূর্ণ সহযোগীতার দ্বারা রাজ্যকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হউন।

সমরনারায়ণ, সিংহনারায়ণ প্রভৃতি সেনাপতিদের মনে ভয় ছিল হয়তো ধন্যমাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন কিন্তু, আজ এই মুহূর্তে তাদের মন থেকে সমুদয় আংশকার অবসান হলো। তারা মনে মনে ভাবলেন মহারাজ সিংহাসন পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন এবং নিজের গতিও যাঁতে তেমনি না হয় সে কথা ভেবে সেনাপতিদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

সভা ভঙ্গ হলো। আচংরফা ও সিদ্ধিকুমার তখনো রয়ে গেছে। কারণ রাজা সভার কাজ শেষ বলে ঘোষণা করলেও সিংহাসন ত্যাগ করেননি। তবে সকলকেই চলে যেতে বলে শুধু দুজনকেই ইঙ্গিতে থাকতে বলেছেন।

দুজনকে নিয়ে বিশ্রাম কক্ষে ঢুকলেন মহারাজ। যুবরাজ থাকা কালীন একদা শিকারে গিয়ে তিনজনে এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। শপথ নিয়েছিলেন বিপদে আপদে কেউ কাউকে পরিত্যাগ করবেন না।

মহারাজের মনে পড়ে -একবার দেবতামুড়ার জঙ্গলে যুবরাজ ধন্য গিয়েছিলেন শিকারে। সঙ্গে একশত বিশ্বস্থ সৈনিক। রায়কাচাগ আর রায়কসম তখন সাধারণ সৈনিক মাত্র। আচরংফা রিয়াং সম্প্রদায়ের আর সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া সম্প্রদায়ের।

হরিণ আর শূকর শিকারের খোঁজ করতে যুবরাজ ধন্য সৈন্যদের থেকে আলাধা হয়ে পড়েন। সকলেই শিকারের খোঁজে ব্যস্ত থাকায় যুবরাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেনি। কিন্তু, দুবন্ধু যুবরাজকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি। আচরংফা আর সিদ্ধিকুমার। এরা দু-জন দু সম্প্রদায়ের হলেও এদের পিতা মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আমলে পাশাপাশি বসবাস করা এবং যুদ্ধে পাশাপাশি থাকতেন। সরকারী কাজের বাইরেও সামাজিক মেলামেশায় ছিল আত্মীয়তার সুর। সেই আত্মীয়তার সুরের প্রতিফলন শৈশব থেকে দু-বন্ধুর একই সঙ্গে খেলাধুলা, একই সঙ্গে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং একই সঙ্গে শিকারে আসা। শুধু তাই নয় সিদ্ধিকুমারের ভগিণী পার্বতি আচরংফাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। ছোট বোনের স্বপ্ন যাতে সার্থক হয় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই সিদ্ধিকুমারের।

ধন্য হরিণের খোঁজে এমন এক গভীর বনে গিয়ে হাজির হলো যে খেয়াল হওয়ার পর নিজেই শংকিত হলো। দু-জন সৈনিককে অনুসরণ করতে দেখে কিছুটা আশ্বস্থ হলো কিন্তু, খুব কাছেই একাধিক বাঘের গর্জনে ভীত হলো।

ধন্যকে অনেক আগে থেকেই বাঘ দুটো লক্ষ্য করছিলো। এবার শিকার হাতের নাগালে আস্রার সঙ্গে

সঙ্গেই দু-দিক থেকে আক্রমন করে বসলো। এর জন্য ধন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা। আর বাঘ দুটোও ধন্য'র সঙ্গী দু জনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ দিলো।

আচরং আর সিদ্ধিকুমার মুহূর্ত দেরী না করে দু-জন দুটো বাঘকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলো। ধন্য-ও অমিত বিক্রমে অসি চালাতে লাগলো।

তিনজন মানুষ আর এক জোড়া বাঘ দম্পত্তির মধ্যে শুরু হলো ক্ষমতার লড়াই। প্রায় তিন ঘণ্টা বিভিন্ন কায়দায় সম্মুখ যুদ্ধ করে শুধু মাত্র বুদ্ধির জোরে জিতে গেলো মানুষ। পরাজিত হলো বনের রাজা। তিনজনেই আহত। তিনজনের শরীর দিয়েই রক্ত ঝরছে। তবু-ও ওরা আনন্দিত। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়, কোন শত্রুর বিরুদ্ধেও নয়, বনের রাজার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে জয় একী কম আনন্দের কথা!

তিনজনেই আলিঙ্গনাবদ্ধ। এ অবস্থাতেই এসে দেখতে পেলো বাকী সৈন্যরা। নিজেদের গাফীলতির জন্য ওরা মনে মনে লজ্জিত হলেও সঙ্গী আচরং আর সিদ্ধিকুমারের প্রভু ভক্তিতে ওরা মুগ্ধ। মুগ্ধ যুবরাজের ঔদার্যে।

রাজধানীতে আনন্দের উৎসব শুরু হলো বিরাট বাঘ-দুটোকে নিয়ে সৈন্যরা রাজধানী পরিক্রমা করলো। রাজধানীবাসী যুবরাজ ও সেই সাহসী সৈনিকদ্বয়ের প্রশংসা করলো।

যুবরাজের সুপারিশে মহারাজ ধর্ম মানিক্য যুবক আচরংফা এবং সিদ্ধিকুমারকে রায় কচাগ ও রায় কসম উপাধিতে ভূষিত করে তাদের এক হাজারী সেনাপতির পদ উপহার দিলেন।

উৎসব শেষে দু-জনকে যুবরাজ ডেকে নিয়ে বললো — তোমরা দুজন আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমরা আমার বন্ধু। এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি কোন দিন কোন পরিস্থিতিতেই আমরা কেউ কাউকে পরিত্যাগ করবোনা। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া

আমাদের কেউ যেন বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। তোমরা আমার কথায় রাজী?

উভয়ে তাদের তরবারী যুবরাজের পায়ের কাছে রেখে বললো— যুবরাজ আমরা চতুর্দ্দশ দেবতার নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আপনার সুখে দুঃখে, বিপদে-আপদে আমরা দু জন আপনার পাশে থাকবো। তিনজন আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়।

বিশ্রামগৃহে তিনজন বসে আছে। ধন্যর বাল্য বন্ধু আরও দু-একজন থাকলেও এই মুহূর্তে রায়কচাগ ও রায়কসম ছাড়া আর কেউ নেই।

প্রধান সেবক দু একবার এসে সুরা আনার অনুমতি চেয়েও পায়নি। সুরার ক্রিয়া থেকে মুক্ত থেকে কিছুক্ষণ তিন বন্ধুতে আলাপ করতে চায়।

ক্ষনিক পর মহারাজ বললো— বন্ধু, আমি একটি মেয়ের সেবায় ঋণী, তার জন্য কিছু করতে চাই। তোমরা বললে তাকে রাজ প্রাসাদে নিয়ে আসতে পারি।

রায়কচাগ কিছুটা জনে কিন্তু রায়কসম কিছুই জানেনা তাই সে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো — কে সে ভাগ্যবতী?

— দেবযানী, চন্তাই এর বড় মেয়ে।

— উত্তম! যেমনী সুন্দরী, তেমনি বিদুষী। তুমি উপকৃতই হবে। প্রধান সেনাপতিও নিশ্চয়ই আপত্তি করবেনা। চন্তাই এর পরামর্শ আর দৈত্যনারায়ণের বাহুবল, এদুটো শক্তি একত্রিত হলে তুমি অজেয় হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারবে। কিন্তু, বন্ধু, সাবধান! মেয়েদের প্রতিহিংসা বড় ভয়ানক। কমলাদেবী যদি এতে ঈর্ষান্বিত হন তা হলে দু-দিকই নষ্ট হয়ে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

— কমলা পতিব্রতা। রাজনৈতিক কারণে রাজাকে বহু বিবাহ করতে হয়। কিন্তু, প্রতিযোগীতার সুযোগ দিতে

গেলেই গোল বাঁধে। আমি সচেতন থাকবো।

সাতসঙ্গী নিয়ে মহারাজ পরদিন বিকেল বেলা চন্তাই এর বাড়ী হাজির হয়। চন্তাই খুব খুশী। মহারাজকে নিয়ে চতুর্দ্দশ দেবতার নির্মাল্য দিয়ে বললো— মহারাজের জয় হউক। আসন গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর যাবেন।

— ঠাকুর মশায়, সিংহাসনে যতক্ষণ বসি ততক্ষণই আমি রাজা। তারপর আপনাদের কাছে আমি সেই স্নেহের পাত্র হয়েই থাকতে চাই।

— তোমার কথা শুনে খুশী হলাম বৎস। ক্ষমতা মানুষকে মহৎ করে, ক্ষমতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। কখনো ক্ষমতার মোহে অন্ধ হবেনা, তাহলেই প্রজারঞ্জক হয়ে আজীবন রাজত্ব করতে পারবে। — এই কে আছিস্? মহারাজ ও তার সঙ্গীরা এসেছেন, কিছু খাবার আনতে বল।

— আপনার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলাম।

— আমার কাছে মহারাজের প্রার্থনা?

— আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনার বাড়ীতে থাকার সময় দেবযানীর যে সেবাযত্ন গ্রহণ করেছি সে জন্য তার কাছে অশেষ ঋণি। সেবার ঋণ কোন ভাবেই পরিশোধ করা যায়না। চেষ্টা করা যায় মাত্র। আমি তার সেবার কিঞ্চিত প্রতিদান দিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে অভিলাশী। আপনার এবং দেবযানীর অনুমতি পেলে আমরা ব্যবস্থা গ্রহন করতে সচেষ্ট হই।

মহারাজের কথাশুনে মৃদু হাসে চন্তাই বলে, তুমি বড় চতুর হে। তোমার চাতুরী আমাকেও পরাস্ত করলো। আমি তোমার প্রস্তাবে খুব আনন্দ বোধ করছি। মনে হয় দেবযানীও তেমনি আনন্দিত হবে।

১৪৬৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে যুবরাজ ধন্য

ধন্যমাণিক্য উপাধী নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন আর ১৪৬৪ খৃঃ জানুয়ারীর শেষ ভাগে চম্পাই দুহিতা দেবযানীকে বিবাহ করে প্রাসাদের দ্বিতীয়া মহিষীর সম্মান প্রদান করেন।

ধন্যমাণিক্য যেন সংসার বিরাগীই রয়ে গেছেন। রাজ-সভায় এসে প্রতিদিনই কিছুক্ষণের জন্য বসেন। রাজসভায় বিচার প্রার্থীরা এলে অমাত্যদের উপরই বিচারের ভার অর্পণ করে নিজের উদাসীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। অমাত্যগণ মনে করেন মহারাজের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল এখনো তার রেশ পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে।

প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ আর উজীর চিন্তামণি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। দৈত্যনারায়ণ বলে – উজীর মশায়, মহারাজ সাধুর অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিই কি সাধু হয়ে গেল? শুনেছি কমলা এবং দেবযানীর প্রতিও তেমন আগ্রহ নেই। এমন হলে তো কয়েক মাস পরেও রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেবে। রাজ্যে এরই মধ্যে রাজপুরুষরা আবার প্রজাদের উপর জুলুম শুরু করেছে। পিলাকের কয়েকজন সর্দার এসে গোপনে সেনাপতি সমরনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে গেল। সিংহনারায়ণ আপাততঃ চুপ থাকলেও বাকী সব সেনাপতিরাই নিজেদের অবস্থা ফেরাতে সচেষ্ট রয়েছে। মহারাজ সত্যিই উদাসীন হলে ভবিষ্যত অন্ধকার।

—কমলাদেবীকে বলুন যেন নাচে গানে মহারাজকে মাতিয়ে তোলে আবার ভোগ লালসায় ফিরিয়ে আনা যায়।

—মেয়েকে সে কথাই বলেছি। যে ইরাণী নর্তকী প্রতাপ মাণিক্যের কাছে স্বর্গের অপ্সরা ছিলো, মহারাজ তার দিকে চোখ তোলেও তাকান না। ইরাণী নর্তকী আমার কাছে দুঃখ করে বলেছে সে রাঙ্গামাটি ত্যাগ করে আবার ঢাকা ফিরে যেতে চায়।

— আমার মনে হয় যে কোন একটা উপলক্ষ্য করে রাজ্যে একটা উৎসবের আয়োজন করা উচিত। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে শুধু ইরাণী তরুণীর নাচ নয় আরও কয়েকজনা নর্ত্তকীকে রাজধানীতে আনা হবে। মহারাজের যাকে পছন্দ হয় তাকেই রাখবেন। বাকীদের পুনবায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—ফেরত পাঠানো কেন, ওদের যে কোন রাজপুরুষের নাচের সভায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

১৪৬৪ খ্রীঃ মার্চ মাস। বসন্তের শুভাগমন ত্রিপুরার প্রতিটি পল্লীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গাছে গাছে ফুলের সমারোহ। পাখীদের আনন্দ উৎসব। ভ্রমরের মন ভোলানো গান। কোকিল আর দোয়েলের প্রতিযোগীতায় ত্রিপুরার আকাশও মুখরিত।

উজীর চিন্তামণি বললো -মহারাজ, আপনার পূর্ব পুরুষ সকলেই দোল উৎসব মহা সমারোহে পালন করতেন। মহারাজ ধনমাণিক্য যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও তিনিও পালন করেছেন। আপনার আদেশ পেলে রাজ্যে বসন্ত উৎসবের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি।

-বসন্ত উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকে আমাদের সঙ্গে আলাদা করে পরিচয় করিয়েছেন। বসন্ত উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেরও আয়োজন করুন। এ-ব্যাপারে মিথিলা থেকে একজন সাত্বিক ব্রাহ্মণকে আনায়নের ব্যবস্থা করুন।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

—আর রাজ্য জুড়ে ঘোষণা করে দিন এ বৎসর যেন কোন কৃষকের কাছ থেকে কোন খাজনা আদায় না হয়।

—তাতে যে অনেক ক্ষতি হবে মহারাজ।

—ক্ষতি ভবিষ্যতে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। আর সর্দারগণ যেন উৎসবে অংশ গ্রহন করেন।

—যথা আজ্ঞা।

মাস ব্যাপি বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ ভেট্ নিয়ে মহারাজের দর্শন আশে উৎসবে যোগদান করেছে। শুক্‌সাগরের তীরে বিস্তর্ণ মাঠ। এই মাঠেই ছাউনি ফেলে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সর্দারদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাতশত উনোনে রান্না হচ্ছে। রাজকোষ খোলে দেওয়া হয়েছে উৎসবের খরচ মেটানোর জন্য। আগত প্রতিনিধিদের থেকে যে ভেট্ এসেছে তার পরিমানও নেহাত কমনয়। দেওয়ান হিসেব করে দেখেছেন এক বৎসরে কর আদায় না করে অর্থ সংগ্রহের যে ক্ষতি হয়েছিল তা প্রায় পুষিয়ে গেছে।

রাজধানীর পূর্বদিকে নাচমহলের স্থান করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন নর্তকীগণ এসেছে তাদের দল নিয়ে। ক্ষুদেঁ ক্ষুদেঁ জমিদারদের তাবুতে নাচ-গান করে টাকা উপার্জন করছে এবং প্রয়োজনে জমিদারবাবু ও সঙ্গীদের সব রকমের আনন্দ দান করছে।

উৎসবের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে মহারাজ ঘোষণা করলেন আজ দুপুরে স্বয়ং মহারাণী ও তার সখীগণ উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করবেন।

মহারাণী স্বয়ং পরিবেশন করবেন শুনে আগত অতিথি-বৃন্দের মধ্যে প্রবল উৎসাহ এবং আনন্দের সঞ্চার হলো বহু নেতার ভাগ্যে মহারাণী দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি আর তিনি কিনা স্বয়ং পরিবেশন করবেন!

আগত অতিথিগণ যার যার উত্তম পোষাক পরিধান করে খেতে বসলেন। মহারাণী কমলাদেবী এবং দেবযানী দুজনেই

তাদের সখীদল নিয়ে হাজির হয়ে উত্তম পরিবেশন দ্বারা সকলের মন জয় করলেন। ভোজন শেষে মহারাণী প্রত্যেক নেতৃবৃন্দকে একটি করে অঙ্গবস্ত্র উপহার দিলেন। আগত নেতৃবৃন্দ নিজেদের ধন্য মনে করলো।

মিথিলা থেকে একজন সাত্বিক ব্রাহ্মণকে আনানো হয়েছে। নাম তার লক্ষ্মীনারায়ণ। সুঠাম দেহের অধিকারী। গৌর বর্ণ। সুন্দর মুখশ্রী। প্রত্যেকদিন কাকভোরে গোমতী নদীতে স্নান করে ব্রাহ্মণ যখন গীতার শ্লোক সজোরে উচ্চারণ করে তার গৃহের দিকে যান রাজপুরুষেরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি তন্ত্র শাস্ত্রেও তার গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি প্রতি অমাবস্যার রাতেই নাকি শ্মশানে গিয়ে বসেন। আবার প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার পূজোও করেন। বিচিত্র মানুষ এই লক্ষ্মীনারায়ণ।

বসন্ত উৎসব শেষ হলো। একমাসে পণ্ডিতজী রাজপুরুষদের মনজয় করে ফেলেছেন। বয়স চল্লিশোর্ধ হলেও মনে হয় পঁচিশ বছরের যুবক। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে যে কোন রাজা তাকে সাগ্রহে সেনাপতির পদ প্রদান করবেন অথচ তিনি সাত্বিক আহার করেন।

উৎসব শেষে পণ্ডিতজী একদিন রাজসভায় এসে বললো — মহারাজ, আমার কাজ ফুরিয়েছে, এবার আমায় যাবার অনুমতি দিন।

এত আদর আপ্যায়ণ, এত সম্মান পেয়েও ব্রাহ্মণ চলে যেতে চায়! উজীর, নাজীর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ অবাক্ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের দিকে তাকায়। একেই বলে নির্লোভ পুরুষ! এত কিছু পেয়েও কোন কিছুতেই মোহ জাগলো না।

ধন্যমাণিক্য ব্রাহ্মণের ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ। ব্রাহ্মণের

কথায় যেন চমকে উঠলেন রাজা। ক্ষণিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ যখন আবার যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলো তখন মহারাজ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন —চলে যাবেন! আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?

—না, না!

—তাহলে? কেন রাজ্যবাসী সকলকে ফেলে চলে যাবেন? আপনার তো স্ত্রী-পুত্র-সংসার কিছুই নেই। কিসের আকর্ষণে যাবেন?

—আকর্ষণ নেই বলেইতো যেতে চাইছি।

—আমরা যে আপনার অনুগ্রহ লাভ করতে চাই। আপনি আমাদের বঞ্চিত করবেন? আমি যে আপনার কাছ থেকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হতে চাই।

—মহারাজ! আপনি দীক্ষা নেবেন?

—হ্যাঁ পণ্ডিতজী, আমি আপনাকেই মনে মনে গুরু বলে গ্রহন করেছি। আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

মৈথেলি ব্রাহ্মণ লক্ষী নারায়ণের আচার আচরণ ও অলৌকিক কিছু ক্ষমতা দেখে ধন্যমাণিক্য মুগ্ধ। মহারাজ মনে মনে ঠিক্ করলেন যে কোন প্রকারেই হউক এই ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে রাখতে হবেই।

মহারাজ অন্যমনস্ক হয়ে বিশ্রামগৃহে ভাবনায় রত। ঘরে আর কেউ নেই। এমন সময় মৃদু পায়ে লক্ষী-নারায়ণ এসে প্রবেশ করে বললেন— মহারাজের জয় হউক।

ধন্যমাণিক্য চমকে উঠলেন ভাবলেন ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অন্তর্য্যামী! নইলে তার মনের কথা কী করে জানবেন? মনে মনে যে তিনি ব্রাহ্মণকেই চাইছিলেন!

মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন ব্রহ্মণকে। বললেন

গুরুদেব, বসতে আজ্ঞা হউক।

— মহারাজ, শুনলাম আপনার ভাই প্রতাপ মাণিক্যকে যারা হত্যা করেছে তাদের উপরই আপনি রাজ্যের ভার দিয়ে রেখেছেন ?

— উপায় কি গুরুদেব !

— উপায় খুঁজে বের করতে হবে। দীক্ষা নেবার আগেই আমাকে গুরুদেব বলছেন কেন ?

— মনে মনে আপনাকে গুরু পদে বরণ করেছি বলে।

— তা হলে কাল বিলম্ব না করে দীক্ষা নিয়ে নাও। কাল প্রত্যূষে একটা ভাল যোগ আছে। তোমার মন চাইলে কাল দীক্ষা নিতে পারো।

— আমি সবদা প্রস্তুত। আপনি যখন বলবেন, তখনই দীক্ষা নেবো।

রাঙ্গামাটি আর রঙ্গপুরের বাসিন্দারা মহারাজের দীক্ষা উপলক্ষে রাজ প্রাসাদে এসে ভূরি ভোজন করে গেল। মহারাজ গরীবদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণ করলেন। সেনাপতিরা মনে মনে ভাবলো - মহারাজের মন এখনো রাজকার্যে বসেনি। এরই ফাঁকে নিজেদের অবস্থা গুছিয়ে নিতে হবে। সিংহ নারায়ণ ভাবে—এবার শুধু মহারাজ বধ নয়। সিংহাসনও চাই ! ধন্যমাণিক্য শেষ হলে দৈত্যনারায়ণকেও অচিরেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে। তখন অন্য কোন সেনাপতি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পাবেনা।

ধন্যমাণিক্য নাচ মহলে বয়স্যদের সঙ্গে নিয়ে নর্তকীদের নাচ দেখছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন।

ব্রাহ্মণকে নাচ মহলে আসতে দেখে সকলেই অবাক্ হলো। সকলেই দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ ওদের

বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসলেন।

— গুরুদেব, আপনি এখানে কষ্ট করে এলেন কেন? মন্ত্রণা কক্ষে ডেকে পাঠালেই হতো।

— মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এখানে চলে এলাম। এসে ভাবলাম তোমাদের আনন্দটা নষ্ট করা আমার উচিত হয়নি।

— আপনি স্বয়ং যেহেতু এখানে এসেছেন, নিঃসন্দেহে প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলুন। মন্ত্রণা গৃহে যাই।

নাচমহল থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন— তোমাদের চন্তাই মহাশয়কে এক্ষুণি আসতে বলে লোক পাঠাও। আমাদের আলোচনায় উনারও পরামর্শ প্রয়োজন বলে মনে করি।

— যথা আজ্ঞা।

মন্ত্রণাগৃহে মহারাজ আর চন্তাই ও ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ বললেন— চন্তাই ঠাকুর, আমার মনে হয় যারা প্রতাপ মাণিক্যকে হত্যা করতে পেরেছে তারা ধন্যমাণিক্যকেও বধ না করে ক্ষান্ত হবেনা। অথচ সমগ্র সৈন্য তাদের হাতে। কৌশল ব্যতিত কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। কৌশলেই সেনাপতিদের আধিপত্য খর্ব করা উচিত। ধন্যমাণিক্য আপনার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র উপরন্তু আপনার জামাতা। আর সে আমার শিষ্য। আমরা উভয়েই তার মঙ্গলাকাংখী। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণও তার মঙ্গলাকাংখী কিন্তু, সে রাজ্য শাসনে যুক্ত। তাই এখনই তাকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। কারণ প্রতাপ মাণিক্যের হত্যার ব্যাপারে তিনি একেবারে নির্দোষ একথা আমার মনে হয় না। যিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন তাকে শুধু বিদ্বান, বুদ্ধিমান হলেই চলবেনা, বলবানও হতে হবে। মহারাজ কয়েকটা যুদ্ধ পরিচালনাও করেছে কিন্তু, তিনি নিজে

সুঠাম দেহের অধিকারী নন। আমি তাকে এক বৎসর ব্রহ্মচের্য্য পালন করে এক বৎসর মল্ল বিদ্যা ও যোগ বিদ্যা শিক্ষা করতে বলি। এক বৎসর পর আমার পরবর্ত্তী কৌশলের কথা প্রকাশ করবো। এই এক বৎসর রাজকার্য্য থেকে দূরে থেকে সেনাপতিদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও অভিহিত হওয়া যাবে। রাণী ও পাত্র মিত্রদের কাছে বলা হবে যে প্রায় এক বৎসরের অনিয়মের ফলে মহারাজ রাজব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম না নিলে মহারাজ অচিরেই মারা যাবেন। আপনি একমত হলে কালই একথা ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

চন্তাই ও রাজা দুজনেই সম্মত হলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হলে বাহুবলই প্রধান ভরসা। শরীর দুর্বল হলে অন্তর জোরে কতদিন চালানো যাবে?

রাজসভা বসেছে। চন্তাই এবং ব্রাহ্মণ আগেই উজীরকে বলে রেখেছেন। তাদের কথা মতো রাজসভায় যখন মহারাজের অসুখের কথা ঘোষণা করা হলো তখন সেনাপতিরা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্দেশ্যে তারা মনে মনে প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শীঘ্র গঙ্গাপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানালো। অন্য সভাসদেরা মনে মনে দুঃখিত হলো। তারা একটি রাজবংশের নির্বংশ হওয়ার আশংকা করলো।

কমলাদেবী চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে কিছুক্ষণ নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদলো। দেবযানীও নিজের কর্মকে দোষ দিয়ে হাপুষ নয়নে কাঁদলো। চন্তাই দুই মহিষীকে শান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন- এক দৈবজ্ঞ বলেছে মহারাজ এক বৎসর যদি ব্রহ্মচৈর্য্য পালন করে ব্রত করেন এবং ইষ্টনাম জপ্ করেন তাহলে এ-রোগ ভাল হয়ে যাবে। তোমরা রাত্রিতে কখনো মহারাজের কক্ষে যাবে না। দিনেও একা

যাবে না সখীদের নিয়ে যাবে আবার এক সময় দর্শন করে ফিরে আসবে।

কমলাদেবী ও দেবযানী তাতেই রাজী হলো। মাত্র তো এক বৎসর! দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

ষোল বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও পিতার আদেশে সেনাপতির কন্যা কমলাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। বিয়ের এক বৎসর পার হওয়ার আগেই ধ্বজকুমার ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু, ভাগ্যের কি বিরম্বনা। শৈশবেই পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হলো। রাজকুমারদের প্রায় এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে কাটানোর পর আবার এক বৎসরের নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হবে তাকে। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সে সব কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

গুরু লক্ষ্মীনারায়ণের তত্ত্বাবধানে শুরু হলো মহারাজের কঠোর তপস্যা। ভগবানকে পাওয়ার জন্য নয়, দেহকে শক্তিশালী করার জন্য। যোগ ব্যায়ামের পাশাপাশি মল্লবিদ্যা, তরবারী শিক্ষা। পাঁচ-ছ জন ছাড়া আর কেউ এ কথা জানলো না। শুধু মহারাজ নয় সেই মল্লবিদ্যার শিক্ষককেও মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে বসবাস করতে হলো।

রাজ্য পরিচালনার ভার মুখ্যত প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ এবং উজীর চিন্তামণির উপর ন্যস্ত হলেও রাজধানীতে সিংহনারায়ণেরই দুর্দান্ত প্রতাপ। রাজধানীর প্রজাগণ সিংহনারায়ণের দাপটে থরথরি কম্পমান। কোন ভাল জিনিষ, কোন সুন্দরী নারী চোখে পড়লে সে আর রক্ষা নেই। রাজধানীতে সুন্দরী মহিলা ও মেয়েদের ঘর বার হওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে মাঝে মাঝে অভিজাত ঘরের মহিলাগণ এসে পূজো দিয়ে যেতেন এখন আর আসতে ভরসা পায় না।

একবার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ পূজো দিতে এসে সিংহ-

নারায়ণের সুনজরে পরে নিখোঁজ হয়ে যায়। মহিলার স্বামী প্রধান সেনাপতির কাছে বিচার দিয়েও সুবিচার পায়নি। দৈত্য নারায়ণ বেশ ভাল ভাবেই জানে সিংহ নারায়ণই হচ্ছে সেনাপতি.দর মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী। তাকে চটাতে গে.ল সমগ্র রাজ্যেই শুধু অরাজকতার সৃষ্টি হবেনা তার নিজের জীবন এবং মহারাজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিলার স্বামীকে বলেছিল—কিছুদিন অপেক্ষা করো ভাই পাপী.কে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সু-সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আর চতুর্দ্দশ দেবতাকে ডাকো!

শুধু সিংহ নারায়ণই নয় বারজন প্রধান সেনাপতির সকলেই প্রজা উৎপীড়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। তারা ধরেই নিয়েছে মহারাজ এ রোগ থেকে আর ভালো হবেন না। একটি বৎসর অপেক্ষা করে দেখা যাক্। এই এক বৎসরে শুধু ভাগ্য ফেরানোই নয়, ভবিষ্যতে যাতে মহারাজ সেনাপতিদের কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে সে দিকেও প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো।

প্রতিদিন বিকেলে এক দণ্ডের জন্য আলো ও জানালা বিহীন অন্ধকার কক্ষে মহারাজের দর্শন পায়। মহারাজের সারা শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকে। মহিষীদের স্পর্শ করা মানা। স্বয়ং গুরুদেব সে সময় কক্ষে উপস্থিত থাকেন সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ আলাপ হবে তাও সম্ভব হয়না। মহারাজ ও মহিষীদ্বয় ভগ্ন মনোরথেই দিন কাটায়। তবুও মহিষীগণের মধ্যে আশা স্বামী আর ক'মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠবেন। দুই মহিষী আর চন্তাই ও ব্রাহ্মণ এই চারজন ভিন্ন বাইরের কোন ব্যক্তির সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। এমনকি প্রধান সেনাপতি তথা নিজ শ্বশুর দৈত্য নারায়ণেরও সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। প্রধান সেনাপতি নিজ কন্যা কমলাদেবীর কাছ থেকেই প্রকৃত

সংবাদ গ্রহণের চেষ্টা করেন কিন্তু, কমলা দেবী নিজেই যেখানে কিছু জানেন না পিতাকে কী করে বলবেন ! অথচ মেয়ের কাছে স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে মেয়ের উপরেও তার সন্দেহ জাগে।

দেখতে দেখতে খারচি পূজা এসে গেল। চন্তাই মারফৎ মহারাজ নির্দ্দেশ দিলেন তিনি নিজে অসুস্থ থাকলেও উৎসবের আনন্দে যেন কোনরূপ ভাটা না পড়ে।

সাতদিন ব্যাপী খারচি পূজো উৎসব রত্নপুর চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে শুরু হয়েছে। প্রতিদিন দশজন করে মানুষ বলি দেওয়া হয়। ছাগ ও মহিষও প্রচুর বলি পড়ে। সাতদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূজো উপলক্ষে এসে জমা হয়। মহারাজকে দর্শন করে, ভেট্ও দিয়ে যায়। এবার মহারাজের প্রতিনিধি রূপে দৈত্যনারায়ণ ভেট্ গ্রহন করছেন। প্রজাদের মনে রাজদর্শন না পাওয়ার বেদনা।

যুদ্ধ বিগ্রহ হলে যে সমস্ত যুদ্ধ বন্দী থাকে তাদের সকলকে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দেওয়া হয়। গোমতী নদীতে গঙ্গা পূজার সময়ও একশত আটজন মানুষকে বলি দেওয়া হয়।

এবার চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একশত আটজন মানুষকে ধরে আনা হয়েছে বলি দেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন অপরাধী বাকীরা নির্দোষ, নিরীহ প্রজা। প্রজারা এতে আতঙ্কিত হলেও বিরক্ত হয়না। তারা জানে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে এবং গঙ্গা পূজোয় নরবলি না দিলে দেশের মহা অকল্যাণ হবে।

দৈত্য নারায়ণের উদ্যোগে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য একশত আটজন মানুষকে জোগার করা হয়েছিলো কিন্তু, যখন বিভিন্ন পরগনা ও থানা থেকে রাজ প্রতিনিধিরা এলেন

তারাও বলির জন্য বহু মানুষকে ধরে নিয়ে এলেন। সাতদিন পর হিসেব করে দেখা গেলো দু হাজারের উপর মানুষকে এবারের পুজোয় বলি দেওয়া হয়েছে।

শত শত নিরীহ মানুষের রক্তে পুজো দেওয়ার মধ্যে কতটুকু মানবকল্যাণ আছে তা ভেবে পেলেন না ব্রাহ্মণ। শেষদিন নিশীথ রাতে মহারাজকে ছদ্ম বেশে সাজিয়ে নিয়ে আসেন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে। নররক্তে রঞ্জিত প্রান্তর থেকে বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছে। ব্রাহ্মণ বললেন—রাজা, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এভাবে আর নরবলি দেবেনা। আমি চন্তাইকে বুঝিয়ে বলবো। সাতদিনে মাত্র সাতজন মানুষকে যেন বলি দেওয়া হয়। রাজী ?

—গুরুদেব, যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রু ধরা পড়ে তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় যাতে তাদের অক্ষয় স্বর্গ বাস হয়। নিরীহ প্রজাদের এভাবে বলি দেওয়ার পক্ষ পাতী আমি নই। আমি কথা দিলাম অযথা আর নরবলি দেওয়া হবেনা।

— ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

বৎসর পুর্ত্তির আরও তিনমাস বাকী। এদিকে দেওয়ালী উৎসব সামনে এসে গেছে। চঞ্চল হয়ে উঠে ব্রাহ্মণ। এই ন' মাসের ব্রহ্মচের্যে রাজার শরীর ও মন উন্নত হয়েছে। রাজাকে একদিন বললেন রাজা, আমি কাল তোমার আরোগ্যের কথা ঘোষণা করবো। দিকে দিকে প্রজাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ওরা ভাবতে শুরু করেছে প্রতাপ মাণিক্যের মতো তোমাকেও হত্যা করে বিদ্রোহের ভয়ে সেনা পতিরা রাজ্যবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে। এবার আমার পরিকল্পণার কথা শোন।

তোমার আরোগ্য হওয়া উপলক্ষে এক ভোজ সভার আয়োজন করবে। প্রকাশ্য সভায় প্রজাদের দেখা দেবে।

রাতে সব ষড়যন্ত্র কারী সেনাপতিদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানাবে। খাওয়া শেষে সেনাপতিদের একজন করে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা থাকবে এবং সাক্ষাৎ শেষে অন্য পথ ধরে তাদের চলে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। দশজন প্রধান ষড়যন্ত্র-কারী সেনাপতিকেই পথে গুপ্ত ঘাতকরা হত্যা করবে। শুধু তাদেরই নয়, তাদের বাড়ী-ঘর লুঠ করে তাদের বংশধরদেরও হত্যা করতে হবে। নইলে তোমাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবেনা। আমি চন্তাই এর সঙ্গে গতকাল আলোচনা করেছি। চন্তাইও আমার সঙ্গে একমত।

গুরুদেবের কুটবুদ্ধি দেখে অবাক হয় মহারাজ।

পরদিন ভোর বেলা মহারাজের আরোগ্যের কথা ঘোষণা করা হলো। মহারাজ যে আজ রাজসভায় প্রজাদের সামনে হাজির হবেন সে কথাও প্রকাশ করা হলো।

মহারাজ যখন রাজসিংহাসনে এসে বসলেন তখন সেনাপতি ও অমাত্যগণ এবং উপস্থিত সকল প্রজাই মহারাজের স্বাস্থ্য দেখে অবাক্ হলো। সকলেই ব্রহ্মচর্যের ফলে এবং সাত্বিক ব্রাহ্মণের তপোঃ প্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করলো।

মহারাজ সভায় সকলের কোশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করলেন তারপর সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন এবং সেনা-পতিদের সঙ্গে নৈশ ভোজে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে সকল সেনাপতিকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেনাপতিদের অনেকেই খুশী হলেও সিংহ নারায়ণ, সমর নারায়ণ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিগণ খুশী হতে পারলোনা। তারা রাজার মধ্যে এক তেজস্বী ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে শিঁউড়ে উঠলো। সিংহ নারায়ণ মনে মনে ঠিক করলো—বিষবৃক্ষকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া হবেনা। ভোজ শেষে সবাই এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ধন্য-

মাণিক্যকে সিংহাসন চ্যুত করার এক পরিকল্পণা গ্রহণ করবে।

রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে বিরাট ব্যাপার। সেনাপতিদের ভূরি ভোজনের আয়োজন। মহারাজ নিজে ও সেনাপতিদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করলেন। মহারাজের দুই মহিষি স্বয়ং পরিবেশন করলেন।

ভোজন শেষে মহারাজ বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেনাপতিগণও ভোজন শেষে তাম্বুল সেবন করে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। মহারাজের প্রধান দেহরক্ষী সেনাপতিদের সবিনয়ে বললো-মহারাজ বলেছেন এক এক জন করে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে পূবদিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবেন। মহারাজ নিজ হাতে প্রত্যেক সেনা-পতিকে পুরস্কার প্রদান করতে চান।

গুপ্ত কক্ষে গুপ্তঘাতক গণ প্রস্তুত। ওদের বলে দেওয়া হয়েছে কাদের হত্যা করতে হবে। দু তিন জন সেনাপতি যখন মহারাজের কাছ থেকে সুদৃশ্য তরবারী এবং উত্তরীয় উপহার নিয়ে সমর নারায়ণদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হলো তখন ষড়যন্ত্র-কারী সেনাপতিগণ ভাবলো এই পৃথক ভাবে দেখা করার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই। তারাও একে একে মহারাজের দর্শন আশায় এগিয়ে গিয়ে গুপ্ত ঘাতকগণ কর্তৃক নিহত হলো। সেনাপতিদের মৃতদেহ অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হলো। প্রজাগণ ও অমাত্যগণ কী ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তা টেরও পেলোনা।

পূর্ব পরিকল্পণা অনুযায়ী অতি প্রত্যুষে মহারাজের মোহরাঙ্কিত পত্র নিয়ে প্রতিটি পরগণায় দূত ছুটলো। ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মহারাজ প্রতিটি পরগণায় নূতন করে সেনাপতি নিয়োগ করে তাদের অনতি বিলম্বে প্রাক্তন সেনাপতিদের বাড়ী, প্রাসাদ আক্রমন করে আত্মীয় স্বজন সকলকে বিনাশ করে সমস্ত

সম্পত্তি লুঠ করতে আদেশ দেওয়া হয় এবং রাজাদেশ যথারিতি পালিত হয়।

এক সপ্তাহ পর আবার রাজসভা বসেছে। ধন্যমাণিক্য ১৪৬৩ খৃঃ শেষ ভাগে সিংহাসনে আরোহন করলেও রাজা হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে প্রায় দশমাস পর অর্থাৎ ১৪৬৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে খুশী মনে সিংহাসনে বসার সুযোগ পেলেন। অনেকে তাই মহারাজের দ্বিতীয়বারের সিংহাসনে আরোহন করাকেই প্রথম বলে অভিহিত করলো।

প্রধান সেনাপতিগণের আত্মীয় স্বজন ধন ও সম্পত্তি লোঠের কোন কারণ জানতে পারেনি। সাতদিন পর রাজসভায় মহারাজ নিজেই অমাত্যদের সেনাপতিদের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। বললেন —অমাত্যগণ, আপনাদের অনেকেই সেদিন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, যেদিন আমার ভ্রাতা প্রতাপ মাণিক্যকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। রাজপ্রাসাদে ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে সেই কুচক্রি দশ সেনাপতি আমাকেও হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরপর তাদের আর বাঁচার অধিকার নেই। আমার মনে হয় রাজ্যে যেমন শৃংখলা ফেরানো সম্ভব হবে তেমনি রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর ব্যাপারেও এখন আর কোনরূপ বাঁধা থাকবেনা। জনসাধারণের সঙ্গে জুলুম করে যে অর্থ তারা সঞ্চয় করেছিল তার সবটাই রাজ কোষে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও হত্যা করতে হয়েছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বিশ্বাস ঘাতকদের বংশধরেরাও বিশ্বাস ঘাতকতা করে রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করতো এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি চতুর্দ্দশ দেবতার নাম নিয়ে শপথ করে বলছি আমি রাজ্যে পক্ষপাতহীন শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে সব রকমের

চেষ্টা করবো। আপনারা আমায় সকল ব্যপারে সহযোগীতা করলেই ত্রিপুরাকে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত করতে পারবো।

সমস্ত সভাসদ মিলিত স্বরে মহারাজের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে। সকলেই মহারাজের কাজের সমর্থন জানায় এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সংযোগিতার প্রতিজ্ঞা করে।

— অমাত্যগণ, আমি প্রায় এক বৎসর আগে সিংহাসনে বসলেও দুষ্ট সেনাপতিদের জন্য দেশের কোন কাজ করতে পারিনি। আজ আমার সামনে আর কোন বাঁধা নেই। আপনারা আমার পত্র নিয়ে আমাদের সামন্ত রাজগণের কাছে গিয়ে পরখ করে দেখুন কারা কারা আমাকে সাহায্য করবে, কারা করবেনা। শত্রুদের চিহ্নিত করে অতিসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মহারাজের আদেশ মতো মেহের কুল, পাটি কারা, গঙ্গা-মণ্ডল, বগাসারি, খণ্ডল প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের মনোভাব জানার জন্য দূত যাত্রা করে।

মহারাজ রায় কাচাগ্ ও রায় কসম নামক সেনাপতিদ্বয়কে রাজধানীতে নিয়োগ করেন। প্রত্যেকটি মহকুমার জন্য লস্কর ও হাজরা সেনাপতিদের মধ্যে থেকে রাজভক্ত সেনাপতিদের বেছে নিয়ে তাদের নারায়ণ উপাধী প্রদান করে প্রত্যেক মহকুমায় প্রেরণ করেন।

দূতেরা সকলেই ফিরে এলো। একমাত্র খণ্ডল ছড়া আর কোন জমিদার মহারাজের বশ্যতা শিকারে অসম্মতি প্রকাশ করেনি।

দৈত্য নারায়ণ শুনে রাগে অগ্নি শর্মা হয়ে উঠলেন। বললেন—সামান্য জমিদারের এতবড় সাহস!

দূত সবিনয়ে বললো—মহারাজ, খণ্ডলের জমিদার পূর্ণ চৌধুরী গৌরের সেনাপতি গৌর মল্লিকের সঙ্গে দোস্তি করেছে। গৌর মল্লিক জমিদারকে রক্ষা করার ও স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার ব্যাপারে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিনিময়ে গৌরের সুলতান যখন ত্রিপুরা আক্রমন করবেন তখন জমিদারের সহযোগীতা কামনা করেছেন। কারণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় খণ্ডলের যোদ্ধারা অনেক বেশী সাহসী এবং কুশলী।

– বটে! খণ্ডলকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যা ত ভবিষ্যতে কখনো ত্রিপুরার বিরুদ্ধাচরণ না করে। প্রধান সেনাপতি আপনি কী বলেন?

—খণ্ডলের মতো সামান্য জমিদারকে দমন করতে বিশাল সেনা পাঠানোর প্রয়োজন নেই মহারাজ। উধম লস্করকে এক হাজার সৈন্য সহ প্রেরণ করুন তিনি অবশ্যই খণ্ডলকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানে সক্ষম হবেন।

উধম্ লস্কর রাজসভায় হাজির ছিলেন। প্রধান সেনাপতির প্রস্তাব শুনে হাতজোর করে দাঁড়িয়ে বললো –মহারাজ, এ অধম এই দায়িত্ব পেলে খণ্ডলের জমিদারকে চরমশিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে।

—আপনি এক হাজার বাছাইকরা সৈন্য নিয়ে কালই যাত্রা করুন। চতুর্দশ দেবতা আপনার সহায় হউন।

উধম লস্কর এক হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে। খবর যায় খণ্ডলের জমিদারের কাছে। জমিদার পূর্ণ চৌধুরী খবর শুনে হাসে। অন্য সময় হলে হয়তো এই এক হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করা মুশকিল হতো এখন গৌরের সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি গৌর মল্লিক স্বয়ং খণ্ডলে বিরাজমান। ত্রিপুরার একহাজার সৈন্যকে ভয় করার কোন কারণই নেই।

মহারাজ রাজধানীতে প্রতিদিন দূতের মুখে বিজয় বার্তা শুনার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করেন। রাজা হওয়ার পর এই প্রথম অভিযান। বুকটা মাঝে মাঝে আশংকায় ভরে উঠে। আবার ভাবেন যদি লস্করের পরাজয় ঘটেই থাকে তাহলে বিশাল সেনা পাঠিয়ে খণ্ডলকে শ্মশানে পরিণত করে দেওয়া হবে।

দশদিন পর দূত ছুটে আসে। মহারাজ প্রাসাদের উপরে বারান্দায় বসে দূতের গোমতী পার হওয়ার দৃশ্য দেখে মনে মনে খুশী হলেন তার জীবনের প্রথম সাফল্য এনে দেবে উধম লস্কর।

মহারাজ উপর থেকে নীচে বিচার কক্ষে গিয়ে বসলেন। সু সংবাদ শোনার জন্য তিনি আগ্রহী। দূত কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচার কক্ষ নতশীরে এসে দাঁড়ালেন। বিষণ্ন মুখ। মহারাজের অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠলো।

দু সংবাদ বহন করে এনেছি মহারাজ! খণ্ডল এবং গৌরের মিলিত বাহিনীর কাছে আমাদের বাহিনী বিধ্বস্ত। সেনাপতি অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে আহত হয়ে শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছেন। শুনেছি তাকে গৌরের সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মহারাজ এই খবরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিং-কর্তব্য অবস্থায় দাড়িয়ে রইলেন। বিচার কক্ষে ঢুকলেন গুরুদেব। বললেন—বৎস, জয়-বা পরাজয়ে কোন রাজাকে উল্লাসিত কিংবা বিমর্ষ হতে নেই। আমি জানতাম এ যুদ্ধে তোমার পরাজয় ঘটবে। কারণ মঙ্গল তোমার বিপক্ষে আছে। বৃহস্পতিও সহায় নেই। একমাত্র শনিই তোমার সহায় রয়েছেন। আমি মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রতিকারের জন্য

এক পূজোর আয়োজন করেছি। পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন যুদ্ধ যাত্রা নয়।

প্রধান সেনাপতি বিচার কক্ষে ঢুকে। অভিবাদন করে বলে—মহারাজের জয় হউক। আমি এ দুঃসংবাদকে এখনো দুঃসংবাদ বলেই মনে করছি। আপনি ভাববেন না, আমি আগামী কাল যুদ্ধ যাত্রা করবো। পূর্ণ চৌধুরীর ছিন্ন শীরতায় মুকুট আপনার পদতলে এনে ফেলে দেবো।

গুরুদেব বলেন—প্রধান সেনাপতি মশায়, আপনার পক্ষে এ কাজ সম্পূর্ণ করা মোটেই দুস্কর নয়। কিন্তু, বর্তমানে স্বয়ং গৌরের সুলতান এ যুদ্ধে জড়িত। এই মুহূর্তে বড় কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ত্রিপুরার পক্ষে অকল্যাণকর হবে। তাছাড়া মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গল কামনায় আগামী অমাবস্যায় আমি শ্মশানে এক অভিচারের আয়োজন করেছি। একজন মানুষ আমার প্রয়োজন হবে। আপনার কাছে কি কোন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি আছে?

—আছে ঠাকুর! কিন্তু, সামান্য এক জমিদারের কাছে পরাজিত হয়ে চুপ করে বসে থাকার অর্থ কী হবে তা বুঝতে পারছেন?

—পারছি। বর্তমানে এ ছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে কোন রাস্তা খোলা নেই। আমার মতে খণ্ডলের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত।

—সন্ধি! এক জমিদারের সঙ্গে? আপনি হাসালেন ঠাকুর মশাই। এতে ত্রিপুরার মান মর্য্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে।

—কিছুদিনের জন্য হবে বৈকি! কাল দূত পাঠিয়ে খণ্ডলের জমিদারকে জানিয়ে দেওয়া হউক মহারাজ খণ্ডলের সৈন্য ও সেনাপতির বীরত্বে মুগ্ধ। তিনি খণ্ডলের জমিদারকে রাজা

উপাধীতে ভূষিত করতে চান। জমিদার মহাশয় যেন রাঙ্গামাটিতে বীর সেনাপতিদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবেন। বিনিময়ে ত্রিপুরাকে বাৎসরিক যৎসামান্য কর মহারাজের সম্মানার্থে ত্রিপুরায় প্রেরণ করলেই হবে।

- তারপর ?

—তারপর ভোজসভার পর সেনাপতিদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল ওদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে।

— খণ্ডলের জমিদার যদি এ প্রস্তাবে সন্দেহ জাগে ?

- জমিদার ভাববে, দ্বাদশ প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করায় ত্রিপুরা বীরশূন্য হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরা তাই কিছুটা সময় চায়। সেও কিছু সময় পেলে খণ্ডলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বেরিয়ে আসবে।

— আপনার যেমন ইচ্ছে।

অমাবস্যার গভীর রাতে কয়েকজন সেনাপতি সহ মহারাজ নিজেও এসে হাজির হন শ্মশানে। দেবী কালীকার কাছে বলি দেওয়া হয় একজন যুদ্ধ বন্দিকে। তারপর তার শবের উপর বসে ঠাকুর মশায় অভিচার করেন। মন্ত্রপুতঃ জল মৃত দেহে ছিটিযে দিতেই মৃত দেহটি নড়ে উঠে। পুরোহিতের ক্ষমতা দেখে সকলেই অবাক্ হন। তারপর ছিন্ন মস্তকে জল ছিটিয়ে দিলে মস্তকটি ও এদিক সেদিক নড়তে থাকে তারপর স্থির হলে ঠাকুর মশায় মস্তকটিকে হাতে তুলে নিয়ে ছিন্ন মস্তকের সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। এরপর শবদেহটাকে খণ্ড বিখণ্ড করে শ্মশানের চতুর্দিকে ছুড়ে দেন আর কী আশ্চর্য্য। মাংস খণ্ডগুলো মুহুর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।

ঠাকুর মশায় সম্পর্কে সকলেরই ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

মহরাজ হাত জোর করে জিজ্ঞেস করলেন – গুরুদেব, আমার ভবিষ্যত কি ?

— উজ্জ্বল। কোন চিন্তা নেই বৎস ! তুমি দীর্ঘকাল স্বাধীন ভাবে সুনামের সঙ্গে রাজ্য শাসন করে যেতে পারবে। খণ্ডল অচিরেই তোমার হস্তগত হবে।

পাত্র-মিত্রের অনেকেই আসল ব্যাপার জানেনা। শুধু এটুকু জানে মহারাজ সামান্য এক জমিদারের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ কথাটাকে বিশ্বাস করতে চায়না আবার কেউ কেউ এ কাজকে কাপুরুষতা মনে করে মহারাজকে ধীকার দেয়।

খণ্ডল থেকে দূত সু-সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। খণ্ডলের জমিদার মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন এবং মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে নিজেকে ধন্য করতে ত্রিপুরায় এসে হাজির হচ্ছেন।

সভা সদেবা মনে মনে হাসে। এক রাজ্যে দুই রাজা। চিরকাল খণ্ডল ত্রিপুরার অঙ্গরাজ্য ছিলো এখন খণ্ডলকে রাজ্য বলে স্বীকার করার অর্থ খণ্ডলের কাছে পরাজয় স্বীকার করা।

খণ্ডলের জমিদারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাজ-প্রাসাদকে আলোক শয্যায় সাজানো হয়। ডোমঘাটি থেকেই তোপধ্বনি করে জমিদারকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অভ্যর্থনার বহর দেখে খণ্ডল থেকে আগত জমিদার ও সেনাপতিগণ বিস্মিত ও খুশী হয়।

পাত্র-মিত্রদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, প্রধান উজীর পাত্র-মিত্রদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি করছেন আর প্রধান সেনাপতি ও মহারাজ স্বয়ং খণ্ডলের সেনানায়ক ও জমিদারের সঙ্গে ভোজসভায় বসেছেন।

প্রত্যেক অতিথির পেছনে একজন করে পরিচারক সুদৃশ্য

পাখা দিয়ে বাতাস করে খাওয়ার ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করছে। সুন্দরী রমনীগণ খাবার পরিবেশন করছে। খুব-তৃপ্তির সঙ্গেই খাবার শেষ করছে অতিথিগণ। পক্ষান্তরে মহারাজ ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ সামান্য মাত্র গ্রহণ করেছে।

খাবার শেষে সকলেই উঠতে যাবে। এমন সময়ই মহারাজ ইঙ্গিত করলেন পরিচারকদের। পরিচারকদের শানিত ছুরির আঘাতে খাবারের থালায় মুখ থুবরে পড়ে গেলো খণ্ডলের জমিদার এবং বীর সেনাপতিরা। মহারাজের মনটা একবার খচ্ করে উঠলো এই কাপুরুষোচিত আচরণের জন্য বিবেকের দংশন অনুভব করলেও তারপরই সেই অনুভূতিকে ঝেড়ে ফেলে পক্ষান্তরে চলে গেলেন। মৃতদেহগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। উপস্থিত সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে পলায়ন করলো।

খণ্ডলে সপ্তাহব্যাপি আনন্দোৎসব চলছিল। এতদিনে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে স্বাধীনতার পথে পা দিয়েছে বলে সকল প্রজাই আনন্দিত তাই ত্রিপুর বাহিনী যখন খণ্ডলের দিকে এগিয়ে আসছিল তখনো সকল প্রজাই ভাবছিল চৌধুরীর সম্মানার্থে এরা খণ্ডল পর্যন্ত এসেছে সিংহাসনে খণ্ডলের ভাবী রাজা পূর্ণ চৌধুরীকে অভিষিক্ত করার জন্য।

উৎসব মুখর রাজধানীতে ত্রিপুর বাহিনী যখন নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা চালাতে শুরু করলো, যখন জমিদার এবং সেনাপতিগণ কেউ ফিরে আসলো না তখন প্রজাগণ ভয়ে বিহ্বল হয়ে যে যেদিকে পারলো নিজের জীবন নিয়ে পালাতে সচেষ্ট হলো। দশদিন ধরে খণ্ডলে হত্যালীলা চালিয়ে পূর্ণ চৌধুরীর পুত্রকে বেঁধে নিয়ে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে ত্রিপুর বাহিনী রাজধানীতে ফিরে এলো।

সেনাপতিদের বধ করাটা জনসাধারণ মেনে নিলেও খণ্ডলের

জমিদারকে নেমন্তন্ন করে এনে এভাবে কাপুরুষের মতো হত্যা করাকে অধিকাংশ রাজধানীর মানুষ মনের দিক থেকে গ্রহন করতে পারলো না। প্রজাগণ মহারাজের নিন্দা করতে শুরু করলো।

জোর করে নিন্দা বন্ধ করা যায়না। ধন্যমাণিক্য বিমর্ষ হয়ে আছে। সত্যিই তো এভাবে খণ্ডলের জমিদারকে হত্যা করা উচিত হয়নি।

বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে চন্তাই আর লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ জানেন ত্রিপুরায় চন্তাই এর অপ্রতিহত ক্ষমতা। এ পরিস্থিতিতে বহিরাগত কোন পুরোহিত প্রভাবশালী হয়ে উঠলে চন্তাই এব পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবেনা। তাই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রায়শই চন্তাই এর সঙ্গে পরামর্শ করে। চন্তাই তাতে খুশী। মেয়ের জামাই যাতে সুখে থাকে সে চষ্টা সে সর্বদাই করছে। তাছাড়া ধন্য অতি স্নেহ ভাজন। যেহেতু আগন্তুক ধন্য'র মঙ্গল কামনাই করে সেহেতু চন্তাই পুরোহিতকে ভালোবাসে।

পুরোহিত ও চন্তাইকে দেখে রাজা দাঁড়িয়ে উভয়কে প্রণাম জানায়। পুরোহিত বলেন – বৎস, তুমি কি বিমর্ষ হয়ে পড়েছ? রাজাদের এটা শোভা পায়না।

—গুরুদের লোকনিন্দা সহ্য করা বড় কঠিন। খণ্ডলের জমিদারকে হত্যা করে যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্যঃ করার কি কোন উপায় নেই?

—আছে! সে কথাই তোমায় বলতে এসেছি।

—কি সে উপায়?

—জন কল্যাণ মূলক কাজ করা। তোমার রাজধানীতে জলের খুব অভাব দেখছি। তুমি একটা দীঘি খনন করে রাজধানীর জল কষ্ট দূর করার চেষ্টা করো। প্রজারা তোমার জয়গান গাইতে শুরু করবে। তাছাড়া চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের

পাশে একটা মন্দির তৈরীর ব্যবস্থা করো। মিথিলা থেকে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করার ব্যবস্থা করো।

- যথা আজ্ঞা গুরুদেব।

— চন্তাই মশায়, আমার প্রস্তাবে আপনি একমত তো?

—আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি! চন্দ্রগুপ্ত চানক্যের মতো বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পেয়ে যেমন উপকৃত হয়েছিল ত্রিপুরাবাসীও আপনার মতো বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে পেয়ে ধন্য

কমলাদেবী ও দেবযানীদেবীকে নিয়ে মহারাজ প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়েছেন। পেছনে কয়েকজন সশস্ত্র অনুচর। মহারাজ কমলাকে বললেন— মহারাণী, গুরুদেব আদেশ করেছেন একটা জলাশয় খনন করে রাজধানীর মানুষের জলকষ্ট দূর করি।

—সে তো অতি উত্তম মহারাজ! সেটা কত বড় হবে?

—তোমরা পরিশ্রান্ত না হয়ে যতটুকু পথ চলতে পারবে তত বড় হবে।

—সত্যিই তাই!

- হ্যাঁ তাই।

—কোথায় হবে?

—রত্নপুরের এই মাঠটা অতি সুন্দর এবং রাজধানীর মাঝখানে অবস্থিত। এই মধ্য স্থানে দীঘি খনন করলে রাজধানীর বহু লোক উপকৃত হবে। রাজধানীর সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাবে।

— বোন, মহারাজ যে অঙ্গীকার করেছেন তা তিনি নিশ্চয়ই পালন করবেন। আমাদের দায়িত্ব হলো প্রজার কল্যাণে নিরলস ভাবে হেঁটে যাওয়া।

—কিন্তু, দিদি, তুমিতো অন্তঃসত্বা! বেশীদূরে হাঁটা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে?

—প্রজার কল্যাণই অনুপ্রেরণা যোগাবে। মহারাজ·

আপনার অনুচরদের স্থান চিহ্নিত করতে আদেশ করুন! আমরা এখান থেকে পথ চলা শুরু করবো।

—তথাস্তু।

মহারাজের নির্দেশে অনুচরগণ দীঘির স্থান চিহ্নিত করলো। তারপর মহারাজ ও রাণীদ্বয় হাঁটতে শুরু করলেন অন্তঃসত্বা কমলার বেশ কষ্ট হচ্ছে তবুও এগিয়ে চলছেন। অনেক দূর এসে কমলাদেবী থামলেন। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়তে শুরু করলো। দেবযানীর উরুতে মাথা রেখে মাটির উপরই শুয়ে পড়লেন। দু জন সখী এসে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে পাশের ছড়া থেকে জল এনে দিলো। মহারাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কমলা ঈশারায় তাকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন।

মহারাজ পরদিন রাজসভায় দীঘি খননের কথা ঘোষণা করলেন। রাজধানীর প্রত্যেক ঘর থেকে একদিন করে সেবা-মূলক কাজে অংশ নিতে আহ্বান জানালেন। প্রজারা শুনে সানন্দে সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন।

যারা খনন কার্যে অংশ নেবে তাদের রাজকীয় খাবারের ব্যবস্থা হলো। প্রতিটি পরগণা থেকে দলে দলে লোক দীঘি খনন কার্যে অংশ নিতে লাগলো। তাছাড়া আশ-পাশ অঞ্চলের হাজার হাজার যুবক সতঃ প্রণোদিত হয়ে খনন কার্যে অংশ নেওয়ায় প্রকৃত পক্ষে কত হাজার লোক প্রতিদিন কাজ করছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া গেলনা, এক একদিন এক এক রকম হিসেব। উজীর নিরুপায় হয়ে শ্রমিক গণণার কাজ স্থগিত রেখে প্রতিদিন বিশ হাজার শ্রমিকের আহারের বন্দোবস্ত করলেন।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খাদ্য সামগ্রীও সাহায্য হিসেবে পৌছতে শুরু করলো মহারাজ ঘোষণা করলেন চৈত্র মাসের মধ্যে খনন কার্য্য শেষ করতে পারলে প্রত্যেক শ্রমিককে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি করে অঙ্গ বস্ত্র উপহার দেওয়া হবে।

খণ্ডল, পাটিকারা, বগাসারি, বেজুরা কৈলা, ভানুগাছী, বিষ্ণু উড়ি, লাঙ্গলা বরদাখাত, মেহের কুল এবং বিভিন্ন মহকুমা থেকে পালা করে হাজার হাজার শ্রমিক শ্রমদান করার জন্য এগিয়ে এলো।

পূর্ণ চৌধুরীর ছেলে সুইল্যা চৌধুরী স্বয়ং শ্রমিক সহ দীঘি খননের কাজে অংশ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। মহারাজ খুশী হয়ে সুইল্যা চৌধুরীকে একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা উপহার দেন।

হাজার হাজার শ্রমিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চৈত্রের মাঝামাঝি সময়েই দীঘির খনন কাজ শেষ হলো। এই দীঘি দৈর্ঘে — এক হাজার গজ এবং প্রস্থে দুশো সত্তর গজ। গভীরতায় দশগজ।

দীঘির আনুষ্ঠানিক উৎসবের আগেই কমলাদেবীর এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। চন্তাই এর নাম রাখলেন— লক্ষ্মী।

দীঘির উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকল স্তরের সকল স্থানের শ্রমিকদের আমন্ত্রন জানানো হলো। শ্রমিকরা সর্বদাই উপেক্ষিত থাকে কিন্তু, মহারাজের কাছ থেকে সদয় ব্যবহার এবং মর্য্যদা পেয়ে ক্রমান্বয়ে অংশ গ্রহণকারী লক্ষাধিক লোক মহারাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। মহারাজের মন থেকে খেদ দূর হলো।

ত্রিপুরার বাইরে থেকে স্থপতি এনে শুরু হয়েছে লক্ষী নারায়ণ মন্দির নির্মানের কাজ। নিজের মনের মতো করে জোড়া মন্দির তৈরীর চেষ্টা করছেন পুরোহিত লক্ষী-নারায়ণ। পুরোহিতের ইচ্ছে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মতো কাজও এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরেরও সংস্কার সাধন করা হচ্ছে। ১৪৬৫ খৃঃ

এপ্রিল মাসে ধন্য সাগর এবং ১৪৬৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে লক্ষী-নারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মহা ধুমধাম করে লক্ষী-নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজ্যের এবং বহিঃ রাজ্যের হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে ভোজন করানো হয় এবং ভোজন দক্ষিণা প্রদান করা হয়।

মহারাজ রাজ্যের সর্বত্র আইন করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে দেন। শুধু তাই নয়। প্রচার করা হয় যে সমস্ত ব্যবসায়ী ওজনে কারচুপি করবে তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে এবং যারা যারা কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করবে তাদের মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হবে। এই কঠোর আদেশের ফলে উশৃংখল ব্যবসায়ী সমাজ সর্তক হয় এবং রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতিতে যথেষ্ট শৃংখলা ফিরে আসে।

রাজ্যে শৃংখলা ফিরে এসেছে। রত্ন পুরে যে বিশাল দীঘি খনন করা হয়েছে প্রজাগণ তার নাম দিয়েছে ধন্য সাগর। নেমন্তন্ন করে এনে সেনাপতিদের এবং খণ্ডলের জমিদার পূর্ণ চৌধুরী ও খণ্ডলের সেনাপতিদের বধ করে যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন দীঘি খনন করে এবং লক্ষী-নারায়ণ মন্দির প্রতিষ্টা করে রাজ্যবাসীর মন থেকে সমালোচনার পাহাড় সরিয়ে দিয়েছেন।

দেবযানীর এক কন্যা হয়েছে। চম্পাই নাতনীর নাম রেখেছেন ফুলকুমারী। ফুল-কুমারী আর লক্ষী মহারাজের ঘরের দুটো ফুল যেন। একজন গন্ধরাজ আর এক জন গোলাপ। লক্ষীর চলাফেরায়, খেলাধুলায় একটু স্বাতন্ত্র লক্ষিত হয়। নিজের পছন্দ না হলে কোন জিনিষ সে গ্রহণ করেনা আর ফুলকুমারী যে যা দেয় তাতেই সে খুশী॥

অন্নপ্রাসন উপলক্ষে লক্ষী একটা সোনার বালা হাতে তুলেছিল তাই পুরোহিত বলেছিলেন তোমার মেয়ে লক্ষী

মস্ত হবে, ওর নাম রাখো লক্ষী। আর ফুলকুমারী অন্নপ্রাসন উপলক্ষে সবকিছু ফেলে একটি গোলাপ ফুল হাতে নিয়েছিল তাই চন্তাই বললেন— এই মেয়ে হবে সৌন্দর্যের পূজারী ভাবুক প্রকৃতির। ওর নাম রাখা হউক ফুল কুমারী।

রাজপুত্র দেব কুমারের ও ধ্বজকুমারের ভার নিয়েছেন স্বয়ং পুরোহিত এবং রাজ গুরু লক্ষী-নারায়ণ। একদিন তিনি মহারাজকে বললেন মহারাজ, রাজ-কুমার এবং রাজকুমারী-গণ তীল তীল করে বড় হচ্ছে। তাদের সু শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে যেমন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করা প্রয়োজন তেমন শিল্প সংস্কৃতিতেও পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন। আমি লক্ষ্য করেছি এরাজ্যে সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের অভাব রয়েছে। মহারাজ বাইরে থেকে শিল্পী এনে রাজকুমারীদের নৃত্যে ও সঙ্গীতে পারদর্শী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ত্রিহুতে একজন নাম করা সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। উনাকে ত্রিপুরায় আনতে পারলে মহারাজের রাজসভার যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে তেমনি আপনার কন্যা-দ্বয়ের শিক্ষার ও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও নিতে পারবেন।

– আপনি সেই সঙ্গীতজ্ঞকে আনার ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার দরজা গুণীজনদের জন্য সর্বদাই খোলা রয়েছে।

মহারাজ রাজসভায় অধিষ্ঠিত। পাত্র মিত্রগণের সঙ্গে সাধারণ আলোচনা চলছে। এমন সময় কৈলা থেকে দূত এলো। মহারাজকে নমস্কার জানিয়ে বললো—মহারাজ, থানাংচির জমিদার একটি অথি সুন্দর শ্বেত হস্তী ধরেছেন। আমাদের সেনাপতি মশায় খবর পেয়ে হাতীটি দেখতে থানাংচি গিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের অনুমান হাতীটির বয়স দু-আড়াই বৎসর হবে। ব্রহ্মদেশ থেকেই হাতীটি এসে থাকবে। সেনা-পতি মশায় জমিদারের কাছে মহারাজের জন্য হাতীটি প্রার্থনা করেছিলেন। হাতীটি অতিব সুন্দর এবং সুলক্ষণ। দৈবজ্ঞ

বলেছেন হাতীটি যার কাছে থাকবে ভবিষ্যতে তিনি দিক্‌পাল আখ্যালাভ করে যশের সঙ্গে রাজ্য শাসন করে যেতে পারবেন।

– জমিদার কী বললো ?

—মহারাজ, বলতে সংকোচ হচ্ছে, সামান্য জমিদারের এত বড় সাহস হবে তা ভাবাই যায় না। মহারাজকে হাতীটি উপহার দিতে অস্বীকার করেছেন।

—প্রধান সেনাপতি মশায়, আপনার অভিমত কি ? হাতীটি কি নিয়ে আসা উচিত ?

— অবশ্যই মহারাজ। পৃথিবীতে যা সুন্দর তাই রাজার প্রাপ্য। রাজা সমর্পন করেন দেবতাকে। পৃথিবীর যত মূল্যবান রত্ন তার অনেকটাই কোননা কোন মন্দিরে রক্ষিত আছে। থানাংচির জমিদারের উচিত হাতীটাকে স্বেচ্ছায় মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া।

—আপনি কালই দূত প্রেরণ করুন। যদি রাজী না হয় তা হলে বল প্রয়োগ করে হাতীটাকে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

থানংচিতে তখন উৎসব চলছে। গতরাতে শিকারে গিয়ে থানাংচিরাজ স্বয়ং এক বিশাল শূকর শিকার করেছেন। সেই শিকারকে উপলক্ষ করেই উৎসব। ত্রিপুরার দূতকে আসতে দেখে থানাংচিরাজ তাকেও আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন।

দূত রাজাকে প্রণাম করতে বললো মহারাজ, বিশেষ কাজ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আপনি আজ আমাদের অতিথি হিসেবে যোগদান করুন, কাল আপনার কথা শুনবো। আনন্দ থেকে আমাদেরও বঞ্চিত করবেন না, নিজেও বঞ্চিত হবেন না। প্রহরী, মহামান্য অতিথির থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দাও। কাল রাজ দরবারে অতিথির সঙ্গে দেখা হবে।

পরদিন রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে দূত ত্রিপুরার মহারাজার পত্রটি মন্ত্রীর হাতে তুলে দিলো। মন্ত্রী পত্রটি পড়ে বললো— বটে! ত্রিপুরার সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক রয়েছে. তাই বলে তিনি যা চাইবেন তাই আমাদের মানতে হবে এমনতো হতে পারে না? দূত, আপনি গিয়ে রাজাকে বলবেন ঐ শ্বেত হস্তী আমাদের জাতীয় সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাকে আমরা অন্যকে দিতে পারিনা। মহারাজ যেন এই অনিচ্ছার জন্য ক্রোধ না করেন।

একমাস পর দূত ফিরে এলো। মহারাজকে অভিভাদন করে মোহরাঙ্কিত পত্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দিলো। মন্ত্রী পত্র পড়ে মহারাজকে বললো মহারাজ, অনতি বিলম্বে থানাংচিতে ত্রিপুর সৈন্য প্রেরণ করা হউক। শ্বেত হস্তীর খবর পেলে জয়ন্তিয়া কিংবা অহোমরাজ থানাংচি আক্রমণ করে হাতীটি লুঠ করে নিয়ে যেতে পারে।

—কাকে পাঠাবো?

রায় কাচাগ্ ও রায় কসম্ দাঁড়িয়ে মহারাজকে অভিভাদন করে বললো মহারাজের আদেশ হলে আমরা দুজন থানাংচি যাত্রা করতে পারি।

মহারাজ বললেন —আজ বিকেলে মন্ত্রণাগৃহে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। আপনারা দুজন সন্ধ্যায় আমার বিশ্রাম কক্ষে সাক্ষাৎ করবেন।

বিকেলে মন্ত্রী, উজীর, এবং প্রধান সেণাপতি মন্ত্রণাগৃহে মিলিত হয়ে কাকে প্রধান করে থানাংচি পাঠানো যায় এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে বসলেন। দৈত্যনারায়ণ বললো—মহারাজ, রায় কাচাগ, রায় কসম দুজনেই বীর। কিন্তু, রায় কাচাগ অত্যন্ত কুশলী সেনা নায়ক। তাকেই প্রধান করে পাঠানো হউক।

রায় কসমের তাতে আপত্তি থাকবে না। রায় কসমের বোনের সঙ্গে শীঘ্রই রায় কাচাগের শুভ পরিণয় হবে। দুজনকে একসঙ্গে পাঠালে ভালই হবে।

সন্ধ্যার পর রায় কাচাগ্ আর রায় কসম এসে মহারাজের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে। মহারাজ তখন রাজ পুরোহিত চন্তাই এবং রাজ গুরু লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে আলাপরত। মহারাজ দু-জনকে সাদরে পাশের কেদারায় বসালেন। বললেন—গুরুদেব এবং চন্তাই ঠাকুর তোমাদের অভিযানকে সমর্থন করেছেন। আমি জানি তোমরা দু-জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোমরা। থগুলের মতো যদি ত্রিপুর বাহিনী থানাংচিতেও পরাজিত হয় তাহলে ত্রিপুরার মান সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে এবং বিদেশী রাজাগণ আমাদের দুর্বল ভেবে রাজ্য আক্রমণ করে বসবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনীত করে সমস্ত দায়িত্ব রায় কাচাগের উপর অর্পণ করছি। সেণাপতি হিসেবে তোমাকে অভিষিক্ত করে চতুর্দ্দশ দেবতা ও লক্ষ্মীনারায়ণের আশীর্বাদ সঙ্গে দেওয়া হবে। চন্তাই ঠাকুর এবং গুরুদেব আশীর্বাদ নিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার একান্ত বিশ্বাস তোমরা কার্যে সফল হয়ে অতি শীঘ্রই ফিরে আসবে। আজ নৈশভোজে তোমরা দুজন আমন্ত্রিত।

রাত্রিতে খুব আদরের সঙ্গে দু-সেনাপতিকে আপ্যায়িত করা হয়। দু-রাজকুমারী খেলতে খেলতে ভোজ সভায় এসে হাজির হয়। ফুলকুমারী বলে—মামা, তোমরা সাদা হাতী আনতে যাচ্ছো? হাতীটার সঙ্গে আমরা দু-বোন খেলা করবো।

রায়কাচাগ দু জনকে আদর করতে করতে বলে—অবশ্যই খেলা করবে। আমরা যত শীঘ্র পারি হাতী নিয়ে রাজ্যে ফিরে আসবো।

পনরদিন পর ত্রিপুর সৈন্য থানাংচিতে হাজির হয়।

থানাংচিংরাজ আগে থেকেই খবর পেয়ে দুর্গকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করে তোলেন। বিরাট এক পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখানে রাজপ্রাসাদ পাহাড়টি পাথুরে মাটিতে গড়া। পাহাড়টিকে কেটে এবং ছেঁচে এমন করা হয়েছে যে খোদ পাহাড়টিই সুরক্ষিত, সু উচ্চ পাচিলের কাজ করছে। তা ছাড়া রাজ-প্রাসাদের জন্যও রয়েছে চারহাত উঁচু এক পাঁচিল।

থানাংচি পাহাড়ী রাজ্য। জুমের উপরই একমাত্র নির্ভরশীল। তা ছাড়া রয়েছে কমলা বাগান। পাহাড়ের ঢালু অংশে সারি সারি কমলার গাছ। গাছে গাছে সবুজ কমলা। মাস খানিক পরই কমলা পাকতে শুরু করবে। জুমের সঙ্গে যে কার্পাস লাগানো হয়েছিল তাতেও গুটি হয়েছে। কোন কোন গুটি পেকে ফেটে বাতাসে পাঁজাতুলা মেঘের মতো শুভ্র তুলা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পাহাড়ের উপর সৈন্যরা তীর-ধনুক এবং বর্শা নিয়ে সর্বদা দুর্গ পাহাড়া দিচ্ছে। এ সময়টা সকলেরই বিশ্রামের সময়। জুম উঠে গেলেই আর বিশেষ কাজ নেই। যুদ্ধ উপলক্ষে সকল প্রজাই ধান ও জুমের তরকারী দিয়ে রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে। দুর্গের মধ্যে সৈন্যরা বেশ আরামেই আছে।

রায়কাচাগ লক্ষ্য করে দেখলো থানাংচির সৈন্যরা বহু দূর থেকেই ত্রিপুর সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করতে সক্ষম হচ্ছে অথচ ত্রিপুর সৈন্যের দুর্গের ধারে কাছেও যাবার ক্ষমতা নেই। এরশত গজের কাছে যেতেই দুর্গের উপর থেকে শত শত বিষাক্ত তীর ছুটে আসে। এর সামান্য আঘাতেই যে কোন বীরের মৃত্যু অনিবার্য। তীরগুলো বানানোর সময়ই তীব্র বিষাক্ত লতার রস তীরের ফলায় লাগানো হয়। আর সেই তীরের সামান্য আঘাত লাগলে তা রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে মৃত্যু ঘটায়।

পাহাড়ে উঠার দুটো রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তায় বিরাট লোহার দরজা। আর দরজার উপরে সৈন্য থাকার জায়গা। সেই দরজা ভেঙ্গে যে দুর্গে প্রবেশ করবে সে ক্ষমতা নেই। দুর্গের চারিপাশের বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে দু-একটা গাছ ব্যতিত আর কিছুই নেই। দুর্গের পাহাড়ের ঢালু জায়গায় কোন গাছ নেই। গাছ রয়েছে দুর্গের মাথায় প্রাসাদের চতুর্দিকে। রায় কাচাগ প্রমাদ গুণে।

দিন গুণতে গুণতে ত্রিপুর সৈন্য ক্লান্ত। রায় কাচাগ ভেবেছিল দু-এক মাস যেতে না যেতেই দুর্গে খাদ্য শস্যে টান পড়বে তখন সৈন্যরা বাধ্য হয়ে দুর্গের বাইরে আসতে বাধ্য হবে আর সে সময়েই দুর্গ দখল করা যাবে। তাছাড়া তাদের অন্যতম প্রধান ফল কমলাও পাকতে শুরু করবে। বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা আসবে কমলা কিনতে। লোকজন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সৈন্যদের মধ্যেও কর্তব্যে শিথিলতা দেখা দেবে। কিন্তু প্রায় আট মাস গত হতে চললো, দুর্গে খাদ্য-শস্যের টান পড়েছে কিংবা সৈন্যদের মধ্যে কর্তব্য ভাবে টান পড়েছে এমন কিছু বুঝা গেলনা। বরং এই আট মাসে ত্রিপুর সৈন্য অনেকটা উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছে। বহু বাড়ীতে চড়াও হয়ে এরা নারীর শ্লীলতাহানী করেছে। খাদ্যও ওদের কাছ থেকেই আদায় করতে হয়েছে। ফলে বহু লোক থানাংচ প্রদেশ থেকে জয়ন্তীয়া, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে চলে গেছে।

একদিন শিকারে গিয়ে সৈন্যরা বিরাট একটি গোধিকা দেখতে পেলো। গোধিকাটি লম্বায় প্রায় আট হাত। আস্ত একটি ছাগলকে অনায়াসে গিলে খেতে পারে। গোধিকাটি দেখতে পেয়ে সৈন্যরা উল্লসিত হলো। শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ না পেলেও এই স্থল কুমীরের সঙ্গে কিছুক্ষণ

যুদ্ধের আনন্দ অনুভব করা যাবে।

গোধিকাটি দেখে রায কাচাগের মনে এক ভাবের উদয় হলো। সে সৈন্যদের বললো—বন্ধুগণ, একে হত্যা করা চলবেনা। জীবন্ত ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বাড়ী থেকে একটি ছাগলছানা নিয়ে এসো। ছাগল ছানাটিই তার প্রধান লক্ষ্য হবে। সেই ফাঁকে লম্বা বাঁশ দিয়ে দু-দিক থেকে কয়েকজন তার ঘাড়ের চাপ দেবে আর কয়েকজন উদাল গাছের ছাল দিয়ে পেটে বাঁধ দেবে। তারপর গলায় ও লেজে বেঁধে চ্যাংদোলা করে ওটাকে শিবিরে নিয়ে যেতে হবে। এই গোধিকা আমাদের মনোরথ পূর্ণ করতে পারে।

বহুকষ্টে গোধিকাটিকে বন্দী করা হলো। নিয়ে আসা হলো শিবিরে। সকলেই উৎসুক কোন্ সৌভাগ্যের মুখ এই গোধিকাটি খুলে দেবে তা দেখার। গোধিকাটির প্রচণ্ড ফুস-ফসানি শব্দ মনে হয় বিরাট কোন বিষধর সাপ রাগে গর্জন করছে।

রাত গভীর হলো। থানাংচির দুর্গ থেকে প্রহরীদের হাক-ডাক বন্ধ হয়েছে। দরজার উপরে কয়েকজন প্রহরী প্রহরারত। শুধু ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। প্রত্যেকেই যার যার পোষাক পরে অস্ত্র নিয়ে তৈরী। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তাহলে থানাংচি দখল হবে নয়তো ভগ্ন মনোরথে ফিরে যেতে হবে।

চারজন সৈন্য গোধিকাটিতে পাহাড়ের পেছনের দিকে নিয়ে গেলো। গোধিকাটির মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে পাহাড়ের পাদদেশে ছেড়ে দেওয়া হলো। শুধু-পাহাড়ের উপর দিক উন্মুক্ত রেখে সৈনিকরা অস্ত্রনিয়ে তিনদিক ঘিরে রাখলো। গোধিকাটি তিনদিক আবদ্ধ দেখে পাহাড়ের উপরেই উঠতে

থাকলো। রায় কাচাগের মন আনন্দে নেচে উঠলো।

জ্যোৎস্না রাত্রি। গোধিকাটি পাহাড়ের উপর উঠছে দেখা যাচ্ছে। রায়কাচাগ তখন সৈন্যদের বললো – বন্ধুগণ, এই গোধিকা আমাদের শেষ অবলম্বন। এই দড়ি বেয়ে আট-দশজন সৈনিককে পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে হবে। তারপর সদর দরজায় যে চার-পাঁচজন প্রহরী রয়েছে তাদের বধ করে সদর দরজা খুলে দিতে হবে। তারপর চার হাত উচু পাঁচিল টপকানো কোন বাধার সৃষ্টি করবেনা। যারা এই মহান কাজে ব্রতী হতে চাও তারা এগিয়ে এসো।

দশজন সাহসী সৈনিক এগিয়ে এলো। তারপর দড়ি বেয়ে একজন একজন করে পাহাড়ের উপর উঠে গেলো।

আট মাসে থানাংচির সৈন্যদের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা এসেছে। আগে যেমন কড়া পাহাড়ায় থাকতো তেমনটি আর নেই। বারজন সৈনিকের মধ্যে মাত্র দু জন দরজার উপরের চওড়া পাঁচিলে দাঁড়িয়ে প্রহরারত। বাকীরা ঘুমাচ্ছে। যে দশ জন ত্রিপুর সৈনিক উপরে উঠেছে তারা কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে বর্শা দিয়ে প্রহরারত দুই সৈনিককে বধ করলো। সামান্য গুঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ হলোনা। নিহত হলো ঘুমন্ত বাকী প্রহরীরা। দশজনে মিলে দুর্গের সদর দরজা খুলে দিলো। পাহাড়ের উপর উঠে গেলো ত্রিপুরসৈন্য। সৈনিকেরা মিলে পিরামিড সৃষ্টি করে কিছু সৈন্য ঢুকে গেলো পাঁচিল টপকে দুর্গের মধ্যে। তারপর দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেল। মধ্যরাতে শুরু হলো ক্ষুধার্ত ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে ঘুমন্ত নিরস্ত্র থানাংচি সৈন্যের যুদ্ধ। থানাংচি সৈন্যদের অধিকাংশ সৈন্যই অস্ত্র হাতে নেওয়ার আগেই নিহত হলো। রাত প্রভাত হতে দেখা গেলো থানাংচি সৈন্যদের অধিকাংশ সৈন্যই অস্ত্র হাতে

নেওয়ার আগেই নিহত। থানাংচি সৈন্যের মৃত দেহের স্তূপ জমা পড়েছে। কয়েকজন ত্রিপুর সৈন্য নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। ত্রিপুর সৈন্যর জয়ধ্বনিতে থানাংচির পাহাড় মুখরিত হলো। নিহত হলো থানাংচিরাজ এবং তার দুই পুত্র।

রায়কাচাগ্ সর্বাগ্রে ছুটলো সেই শ্বেত হস্তীর নিকট যাকে পাওয়ার জন্য ত্রিপুর সৈন্য আট মাস যাবত বাড়ীঘর ছাড়া হয়ে তাবুতে রাত কাটাচ্ছে।

আঃ! যেন শ্বেত পাথরে তৈরী একটি জীবন্ত মূর্ত্তি! হাতীটির পরিচর্যায় কয়েকজন মাহুত নিযুক্ত। তারা ভীত-বিহবল। রায়কাচাগ্ তাদের অভয় দিয়ে বললো – ভাইসব, তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা এখানে যেমন আছ তেমনি ওখানেও থাকবে। রাজসুখে রাজ বাড়ীতে থাকবে।

দুর্গাজয় লস্করকে থানাংচির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো। থানাংচি দখলের পরই দু-জন অশ্বারোহী দূত ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলো সুখবর জানানোর জন্য।

শ্বেত হস্তী নিয়ে ত্রিপুর সৈন্য যখন রাঙ্গামাটি এসে পৌঁছলো তখন মহারাজ পাত্র মিত্র সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী ত্রিপুর সৈন্য এবং শ্বেত হস্তীকে উলুধ্বনী ও বাদ্যবাজনা লয়ে বরণ করলো। পুরোহিত শ্বেত হস্তীটির নাম রাখলো গণেশ কুমার।

গণেশ কুমারকে বিশেষ ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজকন্যাদ্বয়ের আবেদন অনুযায়ী শ্বেত হস্তীটিকে রাজকন্যাদ্বয়কে দেওয়া হয়েছে। রাজকন্যাদের সঙ্গে গণেশ কুমারের বেশ ভাব হয়ে গেছে।

থানাংচি বিজয়ের নায়ক রায় কাচাগকে কয়েকটি গ্রাম উপহার দেওয়া হয়।

রায়কসমের বাড়ীতে আনন্দ চলছে। বোন কর্মতি সখীদের নিয়ে নাচের আসর বসিয়েছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ রাজ

প্রতিনিধি এবং স্বয়ং মহারাজ ধন্যমাণিক্যও মহিষী কমলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সেই আনন্দ উৎসবে যোগ দেন।

উৎসবের কারণ হলো থানাংচি বিজয়ী বীর রায় কাচাগ এবার বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। পাত্রী সেই পুরানো বান্ধবী রায়কসমের বোন কর্মতি। তারই প্রাক্ উৎসব। মদ মাংসের ছড়াছড়ি। উপস্থিত রাজপুরুষ সকলেই ভোজনে তৃপ্ত।

রায় কাচাগ রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত রিয়াং মতেই বিয়ের আয়োজন হয়েছে। বর-কন্যাকে সু-সজ্জিত একটি ঘরে রাত্রি যাপন করতে দেওয়া হয়েছে। পরদিন মেয়ের অভিভাবক এবং মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ যদি নিশ্চিত হন এ বিয়েতে কনের সম্মতি আছে তবেই বিয়ে হবে। বিয়ে হলে প্রথা মতো বরকে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতে ঘর জামাই খাটতে হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি হলে ঘর জামাই খাটার পরিবর্তে ধন-রত্ন এবং টাকা দিয়ে রেহাই পাওয়া যায়।

রায় কাচাগ ও কর্মতির মধ্যে কৈশোর থেকেই মনের দেওয়া নেওয়া চলছে। তবুও রিয়াং সামাজিক রীতি অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। রায় কাচাগ কর্মতির বাবাকে ঘর জামাই খাটার পরিবর্তে এক হাজার মোহর যৌতুক দিয়েছে।

ত্রিহুত থেকে এসেছে নৃত্য শিল্পী এবং সঙ্গীত শিল্পী। রাজকন্যাদের নাচ-গান শিক্ষা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নাচ গানের উন্নতিকল্পে ত্রিপুরাতে কয়েকটি নাচ গানের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ওস্তাদ ফয়জল খাঁ এবং সঙ্গীত শিল্পী ভানু চাঁদ গান বাজনায় রাজসভার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রাজকুমারী লক্ষ্মী এবং ফুলকুমারী নাচ গানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে কমলাদেবীর কক্ষে। কমলাদেবী বললেন মহারাজ, দেবকুমার সতেরো পা দিয়েছে। তাকে

যেমন যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করা প্রয়োজন তার আগে তার বিয়ের কাজও সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

—কুমার ধ্বজ থাকতে দেবকুমারকে কি করে যুবরাজ করা যাবে?

—মহারাজ ধ্বজ কুমার আমারই ছেলে। তার একটি পা খোঁড়া। শাস্ত্রে আছে অঙ্গহীন ব্যক্তিকে কখনো রাজপদে বসানো উচিত নয়।

—তুমি বুদ্ধিমতি। গুরুদেবও সে কথাই বলেছেন। তোমার সঙ্গে আমিও একমত দেবকুমারের জন্য কনে খোঁজা দরকার। তোমার জানা মতো কোন পাত্রী আছে?

—চন্তাই এর দৌহিত্রি অর্চণাকে তো মহারাজ নিশ্চয়ই দেখেছেন সে রূপে যেমন গুণেও তেমনি। তা ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও চন্তাই ও সেনাপতিদের স্বপক্ষে রাখার জন্য আত্মীয়তা স্থাপন করতে হয়। মহারাজের যদি অর্চণাকে অপছন্দ না হয় এবং অমত না হয় তা হলে দেবকুমারের জন্য অর্চণাকেই রাজপ্রাসাদে বঁধূরূপে আনা হউক।

—তোমার পছন্দ হয়ে থাকলে বিয়ের ব্যবস্থা করো। শুনলাম তুমি নাকি কিছুদিন আগে কর্মতিদের বাড়ী গিয়ে সেখানে একটি দীঘি খনন করানোর কথা বলে এসেছ?

—হ্যাঁ মহারাজ। ছড়ার জল খেয়ে প্রতি বৎসর বহু প্রজা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মহারাজ যদি অসম্মত না হন তাহলে সেখানে একটি দীঘি খনন করার আজ্ঞা দেওয়া হউক।

—তুমি আমার অতি প্রিয়তমা মহিষী। তোমার খুশীর জন্য আমি রাজ সিংহাসনও ত্যাগ করতে পারি।

—তাহলে, দীঘির কাজ শুরু করতে মহারাজ আজ্ঞা প্রদান করুন।

—কালই ঘোষণা করা হবে। আগামী মাঘ মাসেই দেবকুমারের বিয়ে হবে এবং তার পরই তাকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করা হবে।

১৪৬৯খৃঃ মাঘ মাসে চন্তাই দৌহিত্রি অর্চনার সঙ্গে দেবকুমারের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পর দেবকুমারকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হয়।

বড়মুড়ার পাদদেশে, রায়কসমের পাড়ায় একটি দীঘির খনন কাজ শেষ হয়েছে। ধন্য সাগরের মতো বড় না হলেও একেবারে ছোটও নয়। মহারাজ বললেন– রাণী, এর নাম কমলা দীঘি রাখি?

—না মহারাজ, দেবযানীও রাণী এবং আমার ছোট বোনের মতো। আর গ্রামের নামও রাখা হউক দেবযানী-নগর।

—তোমার যেমন ইচ্ছে।

কমলাদেবীর ইচ্ছে এবং মহারাজের সম্মতি থাকলেও যেহেতু মহারাণীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দীঘি খনন করা হয়েছে এবং নূতন একটি তহশীলের পত্তন হয়েছে সেহেতু মহারাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ সাধারণ মানুষ গ্রামকে মহারাণীনগর এবং দীঘিকে মহারাণীর দীঘি বলেই প্রচার করতে থাকলো।

দৈত্যনারায়ণ বললো– মহারাজ, দেবকুমার যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণের জমিদারগণ গত বৎসর কর পাঠায়নি। এ বৎসরেরও শেষ প্রায়। শুভদিন দেখে যুবরাজকে দক্ষিণে সৈন্যসহ পাঠালে স্বয়ং যেমন কর আদায় করে নিয়ে আসতে পারবে অন্য দিকে যুবরাজের দক্ষিণ দিক সফরে সাধারণ প্রজাদের ত্রিপুরার আনুগত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণাও লাভ করা যাবে। শুনেছি গৌরের সেনাপতি আমাদের সামন্তরাজদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

—আপনি ঠিক বলেছেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যুবরাজকে অনতিবিলম্বে দক্ষিণ সফরে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

পাঁচজন লস্কর ও পাঁচজন হাজরা সেনাপতিকে সৈন্য সহ যুবরাজের সঙ্গে পাঠানো হলো। এরা সকলেই ত্রিপুর সৈন্য বাহিনীর বিশ্বস্ত সেনাপতি। দেবকুমারকে বলা হলো যদি প্রয়োজন হয় তাহলেই যেন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেনাপতিদের সঙ্গে সর্বদা ভালো ব্যবহার এবং সৈন্যদের সঙ্গেও যেন ভালো ব্যবহার করা হয়। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকরাই একান্ত আপনজন।

মহারাণী নিজ হাতে পুত্রকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করে দিলেন। ধন্য সাগরের তীরে সকল সৈন্য ও সেনাপতিদের ভোজে আপ্যায়িত করলেন। সৈন্যগণ মহারাজ ও মহারাণীর জয়ধ্বনিতে ধন্যসাগরের চারপাশ মুখরিত করে তুললো।

দেবকুমারও দেব-দ্বিজে বিশ্বাসী এবং গুরু লক্ষী নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। যাবার প্রাক্‌কালে গুরুদেবকে গিয়ে প্রণাম করলো। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন—লক্ষী-নারায়ণের কৃপায় তোমার যাত্রা শুভই হবে। বিনা যুদ্ধেই তুমি সকলকে ত্রিপুরার আনুগতা স্বীকার করাতে সমর্থ হবে। তাছাড়া গত বছর এরা কর পাঠায়নি বলেই যে এরা ত্রিপুরা বিদ্বেষী হয়ে গেছে তা বলা উচিত নয়। সামন্ত রাজদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে।

দেবকুমার যাত্রা করে। কমলা এবং দেবযানী ছাদের উপর থেকে সাশ্রু নয়নে চেয়ে থাকে। এই প্রথম রাজকুমার সফরে যাচ্ছে। কমলা দু-হাত উপরে তুলে মা দুর্গার প্রতি নমস্কার জানিয়ে ছেলের মঙ্গল কামনা করেন। ছেলে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দেব কুমার কাক্রাবন, চণ্ডিগড়, মেলাগর হয়ে সাভার মুড়া গড়ে এসে উপস্থিত হয়। প্রথম যৌবনের উম্মাদনায় এতটা পথ অতিক্রম করলেও পদাতিক বাহিনী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। একমাত্র কাক্রাবনে এসে গোমতী নদীর তীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে জল-পানি খেয়েছিল সৈন্যরা। তাই বিশ্রামের আদেশ পাওয়া মাত্র সৈন্যরা ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিল।

সাভারমুড়া গড় যুবরাজের আতিথেয়তার জন্য আগেই প্রস্তুত ছিল। মেহেরকুল থেকে দু-জন নর্তকীও এনে রাখা হয়েছে মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু দেবকুমার এত ক্লান্তবোধ করছিল যে খাবারের সামান্য পরেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

ঘোমের ঘোরে অর্চনার কথা মনে হয়, ভুলে যায় সে রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে সাভারমুড়া গড়ে এক কক্ষে শুয়ে আছে। হাত বাড়াতেই পাশে শুয়ে থাকা কোমল শরীরে হাত ঠেকে। দেবকুমার ঘোমের ঘোরেই পাশে শুয়ে থাকা নর্তকীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। নর্তকী নিজেকে ধন্যমনে করে।

প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবতী ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বলে --যুবরাজের জয় হউক। দাসী যুবরাজের মুখ ধোওয়ার জল নিয়ে অপেক্ষা করছে। যুবরাজের অনুমতি হলেই সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

যুবরাজের ঘুম ভাঙ্গে। বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে অবাক্ হয়। গতরাতের নর্তকীকে মনে মনে খুঁজতে থাকে। যে একরাত তার সঙ্গ কাটিয়েছে তাকে একবার ভালো করে দেখাও হয়নি।

সাভারমুড়া গড়ের অধিপতি এসে প্রণাম জানিয়ে বললো— যুবরাজ, আজও কি আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করবো না মেহেরকুল অভিমুখে যাত্রা করবেন ?

— জল খাবার খেয়ে মেহের কুল যাত্রা করবো। আপনি দূত পাঠিয়ে খবরটা পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

—আমরা আগে থেকেই খবর পেয়েছি আপনি সাভারমুড়া গড় হয়ে মেহের কুল যাবেন। সেখান থেকে পাটিকারা, গঙ্গা-মণ্ডল বগাসারি তারপর ভুলুয়া যাবেন। সুতরাং আপনাদের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা সেখানে করা হচ্ছে।

—কাল যে নর্তকী আমার কক্ষে ছিল সে কোথায়?

—যুবরাজকে গভীর ঘুমে দেখে সে যুবরাজের কাছ থেকে বিদেয় নিতে পারেনি। মেহেরকুলে আপনি তার দেখা পাবেন।

—দুর্গাধিপতির কথা শুনে মনে মনে লজ্জিত হলেও খুশী হয়। জীবনের একরাতের সঙ্গিনীকে সে আর একবার দেখতে চায়।

মেহেরকুল পৌছতে বিকেল হয়। তোরণদ্বারে একটি সু-সজ্জিত হস্তী নিয়ে দুর্গাধিপতি স্বয়ং এসে সু-সজ্জিত হাতীর পিঠে বসিয়ে যুবরাজকে প্রাসাদে নিয়ে গেলো। দুর্গাধিপতি মুসলমান। মুসলমান হলেও হিন্দু নরপতির সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে হয় তেমনি ব্যবহার করলো সে।

খাবার শেষে সর্ব্বলংকারে ভূষিতা এক রমণী কারুকার্য খচিত পাত্রে করে পান নিয়ে এলো। মৃগনাভীর গন্ধে কক্ষটা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। রমণী পানের পাত্র টেবিলে রেখে নমস্কার করে বললো—যুবরাজ, অপরাধ নেবেন না, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে আপনার ঘুম ভাঙ্গাইনি। সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

দেবকুমার সোজা হয়ে বসে। অবগুণ্ঠনের ফাঁকে সুন্দর মুখ খানি মেঘের ফাঁকে চাঁদের ঝিলিক মারার মতোই সুন্দর এবং স্নিগ্ধ।

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—দুর্গের সৈন্যাধক্ষ আমার পিতা। সাভারমুড়া দুর্গে আমার দিদি থাকেন। দিদির ওখানে আমি বেড়াতে গিয়ে-

ছিলাম। যুবরাজ এসেছেন শুনে যুবরাজকে দর্শনের অদম্য কৌতূহল দমন করতে না পেরে দিদিকে বলে নর্তকীর সঙ্গে আমিও আপনার কক্ষে গিয়েছিলাম। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন বলে জাগাইনি। আপনি জাগলে আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলার সুযোগ হবে এই লোভে আপনার পালঙ্কের পাশে বসেছিলাম। কখন যে আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম টের পাইনি। যুবরাজ আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন।

দেবকুমার অবাক্ হয়ে অবাক্ কাহিনী শোনে। এ যেন স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার চাইতেও সুন্দর!

—যুবরাজ আমার উপর রাগ করলেন না তো?

—জানো তুমি কাল রাতে কী করেছ?

—না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। কেউ জানলে আমার মান-সম্মান সব শেষ হবে।

—তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আর ভোজনের পর রাতে এসে পান খাইয়ে যাবে।

—যথা আজ্ঞা যুবরাজ।

স্বল্যা চৌধুরী এসে কক্ষে ঢুকলো। যুবরাজকে প্রণাম করে বললো—আমায় ডেকেছেন যুবরাজ?

—হ্যাঁ। আপনার ছেলে-মেয়ে ক'জন?

—কোন ছেলে নেই, দু-মেয়ে। এক মেয়ে পলাশ হাজরার কাছে বিয়ে দিয়েছি। সাভারমুড়া গড়ে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে। আর এক মেয়ে একটু আগে আপনার কক্ষে এসে পান দিয়ে গেছে। সাভারমুড়া গড়ে তাকেও নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মেয়েদের আমি ছেলের মতো করেই মানুষ করেছি। অসি চালনা, ঘোড়ায় চড়া; তীর ছোড়া সবটাতেই এরা মোটামোটি দক্ষ। তা ছাড়া আমার ছোট মেয়ে কাঞ্চন নৃত্য গীতেও পারদর্শিনী।

— আপনার ছোট মেয়ে অর্থাৎ কাঞ্চনের বিয়ে হয়নি?

—না যুবরাজ। পাত্রের সন্ধান করছি। হয়তো শীগ্‌গীরই কোন লস্কর কিংবা হাজরার সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।

—তার চাইতে ভাল পাত্রের খোঁজ পাননি?

—আমি সৈনিক। সৈনিকের সঙ্গেই আমার পরিচয়। আমার খোঁজা-খোঁজিও সেখানেই সীমিত। তবুও মেয়ের ভাগ্য যদি ভালো হয় তা হলে নিশ্চয়ই তেমন সুযোগ আসতে পারে।

— সফর শেষে যাবার পথে আপনার মেয়েকে আমি রাঙ্গামাটি নিয়ে যাবো। আশাকরি আপনার মেয়েকে কোন রাজপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারবো।

—যুবরাজের যেমন ইচ্ছে।

রাত হয়েছে। যুবরাজ শুয়ে শুয়ে কাঞ্চনের জন্য অপেক্ষা করছে। গতরাতের অতৃপ্ত বাসনা যেন আজ আরও তীব্র হয়ে মনকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলছে।

—যুবরাজের জয় হউক।

দেবকুমারের রক্তে তখন তোলপাড় চলছে। বললো—বসো। তোমার পিতা তোমার জন্য পাত্র খুঁজছেন। তোমার মন-পছন্দ কেউ আছে নাকি?

—যুবরাজ, কৌতুহল অনেক সময় সর্বনাশের কারণ হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

—ঠিক্ আছে যার জন্য তোমার সর্বনাশ হয়েছে মহারাজের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানাবো। এমন বিচার করার প্রার্থনা জানাবো তোমার মন থেকে যেন সব ক্ষোভ দূর হয়। তুমি এবার এসো।

—যুবরাজ আমার একটি প্রশ্ন আছে, যদি রাগ না করেন

তা হলে বলতে পারি।

—বলো।

—শুনেছি আপনার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছে, তাকে যুবরাজ না করে আপনাকে করা হলো কেন?

যুবরাজ ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়ে পড়লো। নিজের ক্ষোভকে দাঁতে কামড়ে দমন করে বললো—তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

—না, যুবরাজ, না। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেই এ কথা জিজ্ঞেস করেছি। শুনেছি মহারাজ ধন্য মাণিক্যকে বঞ্চিত করে মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যকে রাজা করা হয়েছিল। পরে আবার মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যকে বধ করা হয়।

—রাজনীতি বড় কঠিন, বড় কঠোর। এ নিয়ে চিন্তা করেও কোন লাভ নেই। দাদা বাবার মতোই রাজনীতিতে একেবারে উদাসীন। প্রায় সময়ই গুরুদেবের সঙ্গে সাধন ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রাজ কার্যে দাদাকে উদাসীন দেখে আমাকেই যুবরাজ করা হয়েছে তা ছাড়া অঙ্গহীন কোন ব্যক্তিকে রাজ-সিংহাসনে বসানো শাস্ত্র বিরোধী। মেয়েদের এত কৌতুহল না থাকাই ভাল।

—আমায় ভুল বুঝবেনা যুবরাজ, আপনার অমঙ্গল আশংকা করেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

—কাঞ্চন, তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ। আমি তোমার বাবার কাছে তোমাকে প্রার্থনা করবো।

কাঞ্চন আনন্দে ও লজ্জায় যুবরাজকে প্রণাম জানিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর কাঞ্চনের বাবা ঢুকে জিজ্ঞেস করে যুবরাজ আমায় ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

—আমার কাছে ? আমি আপনার অধীনস্থ এক সামান্য কর্মচারী। আপমাদের জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আপনার প্রার্থনা নয় আদেশ করলেই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

আপনার কাঞ্চনকে আমি চাই। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চাই। তবে মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষ। আমি ভ্রমন শেষ করে ফেরার পথে আপনি ও আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। আশা করি মহারাজ অমত করবেন না।

দেবকুমার পর্যায় ক্রমে মেহেরকুল, পাটিকারা গঙ্গামণ্ডল, বগাসারি, বরদাখাত এবং ভুলুয়া সফর করে ছ'মাস পর রাজধানীতে ফিরে এলো। আসার পথে কাঞ্চন ও তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

দেবকুমার রাজ্য সফর শেষ করে প্রত্যেক সামন্ত রাজার কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে উপঢৌকন এবং সারা বৎসরের কর নিয়ে ফিরে এসেছে। রাজধানীতে তাই উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসবে প্রত্যেক সামন্ত রাজাও যোগ দিয়েছে।

রাজসভা বসেছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে সভাসদ-দের উদ্দেশ্য করে বললেন অমাত্যগণ, রাজ গুরুর আদেশেই ধ্বজকুমারকে যুবরাজ না করে দেবকুমারকে যুবরাজ করা হয়েছে। আপনারা তাতে সম্মতও হয়েছেন এবং ধ্বজকুমার তার জন্য দুঃখিত নয় বলেই আমার ধারণা। ছোট সময় থেকেই সে দেব-দ্বিজে বিশ্বাসী তাই গুরুদেবের আদেশই দৈবাদেশ বলে মেনে নিয়েছে। যুবরাজের অভিষেক উদ্দেশ্যে ধ্বজকুমারের আগেই দেবকুমারের বিয়ে হয়েছে এবার এই উৎসবকে আরও সুন্দর করে তুলতে চাই ধ্বজকুমারের বিয়ে দিয়ে। পাত্রী দীপসিং নারায়ণের মেয়ে।

দেবকুমার বললো—মহারাজ, আমার একটা নিবেদন ছিল।

—বলো—।

—রাজ্য সফরে গিয়ে আমি একটি রত্ন পেয়েছি। মহারাজের কাছে সে রত্ন প্রার্থনা করছি।

—তুমি যুবরাজ, ত্রিপুরার ভাবী মহারাজ। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকতে পারে না। কোথায় সে রত্ন আমায় দেখাও, আমি তোমাকে এক্ষুণি তা উপহার দিচ্ছি।

কাঞ্চনের বাবার সঙ্গে কাঞ্চন রাজসভায় প্রবেশ করে মহারাজকে প্রণাম জানায়। দেবকুমার কাঞ্চনকে দেখিয়ে বললো—মহারাজ, এই আমার রত্ন।

মহারাজ ও অমাত্যগণ মৃদু হাসলেন। যুবরাজের পছন্দের প্রশংসা করেন। মহারাজ বললেন—ধ্বজকুমারের সঙ্গে তোমাকেও এই রত্ন উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

দেবকুমার মহারাজকে প্রণাম জানায়।

দেবকুমারের সঙ্গে কাঞ্চনের এবং ধ্বজকুমারের সঙ্গে দীনসিং নারায়ণের মেয়ে প্রমিলার বিয়ে হলো। সাতদিন ধরে চললো নাচ, গান আর উৎসব।

আজ উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। নগরে শোভা যাত্রা বের হয়েছে। আগত সামন্তরাজগণ, সেনাপতিগণ, যুবরাজ এবং রাজকুমার ধ্বজকুমার এবং রাজকুমারী ফুলকুমারী শোভা যাত্রায় অংশ গ্রহন করেছে। ফুলকুমারী তার প্রিয় শ্বেত হস্তী গনেশকুমারের পিঠে দোলায় চড়ে বসেছে।

রাজধানীর জনসাধারণ রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে শোভা যাত্রা ও শোভা যাত্রায় অংশ গ্রহণকারি রাজ পুরুষ ও রাজ প্রতিনিধিদের দর্শন করে আনন্দ লাভ করছে।

গনেশকুমারের হঠাৎ কি খেয়াল হলো, সে মাহুতের

নির্দেশ অমান্য করে শোভা যাত্রা থেকে বের হয়ে এলো। মাহুত বার বার গনেশকুমারকে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও গনেশ-কুমার পুর্বদিকে এগিয়ে চললো। মাহুত অংকুশ চালালো গনেশের মাথায়। সে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে পুর্বদিকে ছুটে চললো। মাহুত বললো—রাজকুমারী গনেশকুমার ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এখন ভীষণ বিপদ। আমাদের মেরেও ফেলতে পারে।

ফুলকুমারীও গনেশকুমারের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে থামতে বললো। গনেশ ফুলকুমারীর কথা না শুনে গোমতীতে নামলো। মাহুত সুযোগ বুঝে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফুলকুমারী একা বসে রইলো হাতীর পিঠে কিংকর্তব্য - বিমূঢ় হয়ে।

গনেশকুমার দ্রুত নদী পার হয়ে উত্তর দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চললো। ফুলকুমারী শক্ত করে হাওদায় বসে বসে চতুর্দশ দেবতাকে ডাকতে লাগলো।

মাহুত দৌড়ে এসে রাজ বাড়ীতে যখন এ দুঃসংবাদ দিলো তখন গনেশকুমার অনেক পথ পার হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে চললো উত্তর দিকে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। গনেশকুমার একই গতিতে উত্তর দিকে চলছে। ফুলকুমারী লোকজন দেখলেই সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে আর গনেশকুমার লোকজন দেখলেই প্রচণ্ড বৃংহণ করছে আর গনেশকুমারের বৃংহণে ভীত হয়ে লোকজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে।

গণেশ কুমার ক্রমে তৈল মুড়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। সমতল স্থানে প্রচুর লোক বসতি থাকায় গনেশ কুমার তৈল মুড়ার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ফুল কুমারীর মনে এবার ভয় হলো। এতক্ষণ পথ ধরে

চলছিল তাই মাঝে মাঝে লোকের সঙ্গে দেখা পাওয়া যেতো এখন সে আশা নেই তাই তার জীবনও অনিশ্চিত।

সমতল গ্রাম থেকে একজন অশ্বারোহী যুবক তৈল মুড়ার দিকে আসছিল। এমন সময় ফুলকুমারীর আর্ত চিৎকার তার কানে পৌঁছলো। সে দেখলো একটি শ্বেত হস্তী একটি কন্যাকে নিয়ে বনে ঢুকে পড়েছে। শ্বেত হস্তী দেখেই বুঝতে পারলো এটিই থানাংচি প্রদেশের সেই শ্বেত হস্তী। আর পীঠে নিশ্চয়ই সেই কন্যা যার সঙ্গে হস্তীটির খুবভাব গড়ে উঠেছে। হাতীটি পুরুষ হাতী। রাজকন্যাকে নিয়ে সে পালাচ্ছে। সে দ্রুত বনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

বন ক্রমেই গভীর হচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। এমন সময় ফুলকুমারীর চিৎকার তার কানে এলো। গনেশ কুমার বন বাদার অতিক্রম করার সময় ফুলকুমারীর গায়ে আচর লাগছে আর ফুলকুমারী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে। যুবকটি আরও দ্রুত ঘোড়া ছুটালো।

গভীর জঙ্গল দেখে হাতীট দাঁড়ালো। হয়তো পরিশ্রান্ত হয়েছে। যুবকটি দূর থেকে দেখে ঝোপের আড়ালে ঘোড়া থামিয়ে হাতীটির কাজ লক্ষ্য করছিলো। সে দেখলো কন্যাটি হাতীর পিঠে হাত বুলিয়ে অনুনয় করছে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য।

কয়েক মূহুর্ত হাতীটি দাঁড়িয়ে চারিদিক ভালো করে লক্ষ্য করলো। ঝোপের আড়ালে না দাঁড়ালে যুবকটি হাতীর নজরে পড়ে যেতো। কাছেই বড় একটি গাছ। পাহাড়ের পাদদেশে বন কলার গাছের বাগান। হাতীটির মনে কী ভাব হলো কে জানে সে পেছনের পা দুটো ভেঙ্গে রাজকুমারীকে নামার সুযোগ দিলো। রাজকুমারী নেমে ভয়ে জড়সর হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। হাতীটি একবার রাজকুমারীকে প্রদক্ষিণ করে যে দিকে জলের শব্দ হ'চ্ছিল সে দিকে এগিয়ে গেলো। কয়েক পা গিয়েই ফিরে তাকালো রাজকন্যা তখনো ভয়ে পাথর। মৃত্যু ভয় তাকে গ্রাস করেছে। যুবক বুঝতে পারলো হাতীটি হয়তো জলপান করতে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে রাজকন্যাকে উদ্ধার না করলে অনর্থ ঘটবে।

যুবকটি ঘোড়া থেকে নেমে চুপি চুপি এগিয়ে গেলো ভয়ার্ত রাজকন্যার দিকে। হাতে উন্মুক্ত তরবারী। যদি হাতীটি আক্রমন করে তা হলে প্রয়োজনে লড়াই করে রাজকন্যাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে রাজকন্যার জন্য প্রাণ দেবো।

সত্যি সত্যি হাতীটি জল খেতে ছড়ায় নেমেছে। যুবকটির পায়ের শব্দে ফুলকুমারী ফিরে তাকানো মাত্র তাকে ঈশারায় চুপ করে চলে আসতে বললো। ফুলকুমারী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জীবনের আশা জাগ্রত হওয়ায় দ্রুত এগিয়ে গেলো।

ফুলকুমারীকে নিয়ে ঘোড়ায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে হাতীর বৃংহণে বনভূমি কম্পিত হলো। যুবকটি বুঝতে পারলো এই মত্ত হাতীর পাল্লায় পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। তাই তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বন অতিক্রম করার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত গনেশ কুমার— পেছনে ধাওয়া করলো তারপর ফিরে গেলো গভীর অরণ্যে। ফিরে চললো তার জন্ম স্থানের উদ্দেশ্যে।

রাত হয়ে গেছে। জঙ্গলে পথ চলা অসম্ভব ব্যাপার। যুবকটি ঘোড়া থামালো। নিজেও নামলো ফুলকুমারীকেও হাত ধরে নামালো। তারপর বললো—কন্যা, পথ-ঘাট হীন বনে যে কোন সময় বিপদের মুখে পড়তে পারি। আমার কাছে আলো জ্বালার কোন ব্যবস্থাও নেই। এ অবস্থায় এখানে থাকাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সামনের গাছটায় উঠার বেশ

সুবিধে। আপনার হয়তো বেশ অসুবিধে হবে কিন্তু, গাছে উঠে রাত কাটানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আশাকরি ও ধারে কাছেই থাকবে। আমাকে ফেলে সে পালিয়ে যাবেনা।

প্রথমে একধাপ একধাপ করে যুবকটি উঠলো তারপর ফুলকুমারীকেও টেনে তুললো। বন্য জন্তুর নাগালের বাইরে উঠে ডালের উপর বসে যুবকটি বললো— এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাক। তবে ঘুমের ঘোরে যাতে পড়ে না যাই সে জন্য গায়ের কাপড় দিয়ে গাছের সঙ্গে শরীরকে বেঁধে রাখতে হবে।

ফুলকুমারীর গায়ের ওড়নাটা যুবকের দিকে এগিয়ে দিলো। যুবকটি একটি ডালের সঙ্গে ফুলকুমারীকে এমন ভাবে বাঁধলো যাতে পড়ে না যায়। শেষে নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ডালের সঙ্গে নিজেকেও বাঁধলো। তারপর বললো— কুমারী, এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়নি, তাছাড়া এখন কথা না বললে ঘুম আসতে পারে সে জন্য গল্প বলে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া ভালো হবে। আমার মনে হয় আপনি মহারাজ ধন্য মাণিক্যের কন্যা। শুনেছি ছোট রাজকুমারীর সঙ্গেই এই গনেশ কুমারের খুব ভাব ছিল।

—আপনার অনুমান সত্য। শোভা যাত্রা থেকে গনেশ কুমার আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসে।

আপনার প্রতি গনেশ কুমারের খুব অনুরাগ ছিল। পাছে আপনাকে হারাতে হয় সেজন্য গনেশ কুমার আপনাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল।

—দুঃখের মধ্যেও হাসি আসছে, আমার মনে হয় হঠাৎ ওর শৈশবের কথা মনে পড়েছে আর অমনি পালাতে শুরু করেছে। আমাকে ভালো বাসতো বলেই হত্যা করেনি। আপনার নাম?

—রতন কুমার। মহারাজের অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক। আমি রামচন্দ্রনগর থেকে রাজধানী যাচ্ছিলাম।

—আপনার বাড়ী রামচন্দ্র নগর ?

—হ্যাঁ।

—সেখানেই আপনার স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন সব থাকে ?

—আত্মীয় স্বজন বলতে আমার বৃদ্ধা মা আছেন।

—বিয়ে করেন নি ?

—সৈনিকের চাকুরী করি। বাবাও করতেন। থানাংচি আক্রমনে গিয়ে বাবা শহীদ হয়েছেন। আপনার নাম বোধ হয় ফুলকুমারী ?

—হ্যাঁ, রাজা যযাতি ও দেবযানীর কাহিনী শুনেছেন ?

—না।

—যযাতি দেবযানীকে এক কূয়ো থেকে উদ্ধার করেন। তারপর দেববযানী বলেন—হে রাজন, অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা, আশ্রয়দাতা, প্রাণদাতা এর যে কোন একটি হলেই পতি বা স্বামী হয়। আপনি কূয়ো থেকে তুলে জীবন দান করেছেন, উলঙ্গ ছিলাম বলে বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছেন। সুতরাং আপনি আমার স্বামী।—মহারাজ যযাতি তখন গুরুকন্যা দেবযানীকে বিয়ে করেন। আজ আপনিও আমার প্রাণ দান করেছেন সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে আপনিও আমার পতি।

—লজ্জা দেবেন না রাজকুমারী। রাজসৈনিক হিসেবে আমার কর্তব্য রাজ্য ও রাজপুরুষদের রক্ষা করা। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।

—শাস্ত্রের কথা যদি সত্য হয় তা হলে আপনি আমায় অস্বীকার করলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করতে পারিনা। প্রভাতে রাজসভায় গিয়ে মহারাজের কাছে আমাদের কথা জানাবো তিনি নিশ্চয়ই ন্যায় বিধান দেবেন।

—তাই ভালো।

রাত্রি প্রভাত হলে ঘোড়াটির নাম ধরে ডাকতেই বনের ভেতর থেকে হাজির হলো সে। ফুলকুমারী ঘোড়াটির প্রভু-ভক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলো।

—রাজকুমারী, এবার আমাদের যেতে হবে। কিন্তু, আপনার এই বেশ আমাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে। তাই আপনার পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। আপনার গায়ের ওড়না আপনার কোমরে জড়িয়ে নিন। আমার মাথার পাগড়ী দিয়ে শরীর ঢেকে নিন। এখান থেকে সারাদিন পথ চললে আমাদের কিল্লা পৌঁছানো যাবে। সেখান থেকে আর একটা ঘোড়া সংগ্রহ করে রাজধানীতে পৌঁছানো যাবে। আর পাশের গ্রামে যদি ঘোড়া পাই তা হলে কিনে নেওয়া যাবে।

—যা ভালো হয় তাই করুন।

রাজকন্যা তার পরিচয় ঢাকবার জন্য রতনের পাগড়ী গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর ঘোড়ায় দু-জনে চড়ে বন থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই তারা একটি পাড়ায় এসে পৌঁছলো। কয়েক ঘর মাত্র আদিবাসী। জুম চাষই তাদের একমাত্র কাজ : বিস্তৃর্ণ বনভূমিতে যে পরিমান জুম চাষ করে তাতে বেশ সচ্ছল ভাবেই তাদের জীবন কেটে যায়।

অশ্বারোহী মাত্রই রাজপুরুষ অথবা সৈনিক এটা তারা ভালো করেই জানে। তাই অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহীকে দেখে সর্দার এগিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। রতন বললো—কুমারী, সারা-দিন ও সারারাত আমরা অভুক্ত। তাছাড়া গতরাতের অনিদ্রায় শরীর আরও অবসন্ন। এখানে খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যাত্রা শুরু করা যাবে।

ফুলকুমারী সত্যি সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিল।

রতনের কথায় মৃদু হেসে বললো—আজ রাতে এখানে বিশ্রাম করে কাল যাত্রা করলে আরও ভালো হয়। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

সর্দারের স্ত্রী এসে ফুলকুমারীকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। জিজ্ঞেস করলো—তোমরা বুঝি স্বামী-স্ত্রী? ফুলকুমারী মৃদু হেসে অনুচ্চ স্বরে বললো-হ্যাঁ।

খাওয়ার পর শোওয়া মাত্রই দু-জনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ঘুম থেকে যখন উঠলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

সর্দারবললো—হুজুর খাবার তৈরী হয়ে গেছে, আসুন খেতে বসি।

—এই সন্ধ্যায়?

—হ্যাঁ। আমরা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করি। আমাদের জ্বালানী তৈলের বড় অভাব। বুনো রণা গাছের বিঁচি থেকে যে তৈল পাওয়া যায় তাই মাটির প্রদীপে প্রয়োজনে জ্বালাই। নয়তো কাঠের আগুনই আমাদের একমাত্র ভরসা। চব্বিশ ঘন্টা আমাদের ঘরে আগুন রক্ষিত থাকে। আপনি আমাদের অতিথি, আপনার সম্মানে আমরা আজ খাবার পর সামান্য নাচ-গানের আয়োজন করেছি।

—আপনাদের আতিথেয়তার তুলনা হয়না।

নিজেদের হাতে বোনা কাপড় আর জুমে উৎপন্ন তুলো দিয়ে তৈরী বিছানা পেতে দেওয়া হলো। ফুলকুমারীর জীবনের প্রথম সোহাগ রাত অতিবাহিত হলো নাম না জানা এক অখ্যাত পাহাড়ী পল্লীতে বিনা আরম্বরে বিনা অনুষ্ঠানে। পরদিন সূর্যোদয়ের পর শুরু হলো পথ চলা। যখন কিল্লার কাছাকাছি এলো তখন বিকেল হয়ে গেছে।

রতন বললো—রাজকুমারী, কিল্লায় গিয়ে সত্য গোপণ

রাখলে আমার শাস্তি হতে পারে। আর এক ঘোড়ায় তোমাকে আমাকে দেখলেও মানুষের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। এখন কিল্লায় গিয়ে সব বলবো না বিল্লার কাছে আমার এক বন্ধু থাকে তার বাড়ীতে অতিথি হবো ?

—আমাকে খোঁজার জন্য চারিদিকেই লোক পাঠানো হয়েছে। কিল্লায় গেলে পরিচয় গোপণ রাখা যাবে না। তার চাইতে তোমার বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে বন্ধুর বাড়ীতে রাত কাটানোই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে মনে হবে। মহারাজ কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না কিন্তু, বিধিব বিধানে আমরা যে একত্রিত হয়েছি তাকে তো অস্বীকার করা চলেনা।

বাল্যবন্ধু কাশীরামও রাজসৈনিক। কিল্লা থানায কর্মরত। নূতন বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আলাধা থাকে। বন্ধুকে পেযে খুব খুশী। বন্ধু পত্নীর রূপে অবাক্। কাশীরাম স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি চন্তাই দৌহিত্রি, রাজকুমারী এক সামান্য সৈনিকের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পথ চলছে, একই সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

স্বপ্নের দুটো রাত কাটিয়ে দুপুর বেলা চন্তাইএর বাড়ী গিযে হাজির হলো ফুলকুমারী। চন্তাইএর বাড়ীতে আনন্দের উৎসব বয়ে গেলো।

দিদিমার কোলে মাথা রেখে দু-দিনের সমস্ত কথাই খুলে বললো ফুলকুমারী। চন্তাই গৃহিণী ফুলকুমারীর কথা শুনতে শুনতে বার বার শিউড়ে উঠতে লাগলো আর আদরের নাতনিকে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলো—ফুলকুমারী, দিদি ভাই আমার, ওসব কথা আর কারও কাছে বলিসনা যেন। মহারাজ শুনলে তার যেমন মর্য্যাদার হানি ঘটবে তেমনি তোমারও সর্বনাশ হবে। যা ঘটছে তা স্বপ্ন বলেই মেনে নেওয়া উচিত। তোমার জীবন রক্ষা করেছে সে জন্য মহারাজ তাকে

পুরস্কৃত করবেন। আর তোমাকে যে কোন সামন্ত রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

—আমি বাবার কাছে সব বলবো। যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন তিনিই আমার স্বামী। আমার দেবতা। চন্তাই ও তার স্ত্রী ফুলকুমারীকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়।

মহারাজ রতনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—যুবক ফুলকুমারীর জীবন রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে হাজরা পদে নিয়োগ করলাম। তুমি আমার আদেশ নিয়ে কালই কৈলাগড় যাত্রা করো।

রাজসভায় ফুলকুমারীকে দেখে বিস্মিত মহারাজ, বিস্মিত সভাসদ। মহারাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—রাজকুমারী তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

—হ্যাঁ মহারাজ, যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন তাকেই আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। মহারাজ দয়াপরবশ হয়ে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করে আমার প্রাণ দাতার সঙ্গে গমনের অনুমতি প্রদান করুণ।

রাগে কাঁপতে থাকেন মহারাজ। বললেন—ফুলকুমারী, তুমি রাজবংশের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে চলেছ। সৈনিককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে কৈলাগড় পাঠানো হচ্ছে। তুমি অন্দর মহলে গমন করো।

—মহারাজ ন্যায় পরায়ন। দেবযানীর প্রাণ রক্ষা করায় দেবযানী দেবর্ষি কণ্যা অর্থাৎ শুক্রাচার্যের কণ্যা হয়ে ক্ষত্রিয় যযাতিকে বিয়ে করেছিলেন। দৈবক্রমে এই বীর সৈনিকের সঙ্গে আমার জীবন সূত্র গঠিত হয়েছে। মহারাজ ন্যায় বিচার না করলে এই রাজ সভার সামনে আমি আত্মহত্যা করবো।

—প্রহরী, এক্ষুনি এই কুলটাকে রাজসভা থেকে বের করে দাও। আর সেই সৈনিককে বন্দী করে রাখো।

চন্দ্রাই আর পুরোহিত রাজসভায় প্রবেশ করলে সকলেই যার যার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়।

নিজেদের আসনে বসার পর রাজগুরু বললেন—মহারাজ, বিধির বিধান কেউ ভঙ্গ করতে পারে না। বিধির বিধানেই ফুলকুমারীর জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। একটি গল্প বলি শুনো—

মহারাজ রাবণ স্বর্গ জয় করে রাজ্যে ফিরছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন একজন সাধারণ লোক নদীর তীরে বসে দুটো গাছের ডাল বার বার একত্র করছে আর ছাড়ছে। রাবণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? লোকটি উত্তর করলো—আমি বিধাতা। উত্তর শুনে রাবণ জিজ্ঞেস করলো—এসব কী করছো? বিধাতা উত্তর করলো—যৌটক মেলাচ্ছি। কোন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ের বিয়ে হবে তা নির্দ্ধারণ করছি।

উত্তর শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলো রাবণ। বললো—তুমি যদি সত্যিই বিধাতা হয়ে থাকো আর সত্যি সত্যিই যদি তোমার বিধান অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন হয় তা হলে আমি রাবণ বলছি তোমার যে বিধান আমি ভেঙ্গে দেবো।

রাবণের কথা শুনে হেসে উঠলেন বিধাতা। বললেন—রাবণ, তুমি ত্রিভুবন জয়ী হতে পারো কিন্তু, বিধাতার বিধান ভঙ্গ করার মতো ক্ষমতা তোমার নেই। আমি এক্ষন যে যোটক মিলিয়েছি সেটি হলো এক দৈত্যরাজের মেয়ের সঙ্গে এক রাজকুমারের বিয়ে যদি পারো তো সে বিধান ভঙ্গ করো।

রাবণ বিধাতার কথা শুনে তক্ষুনি সেই দৈত্যরাজের রাজ্যে গিয়ে শুনলেন এক রাজকুমারের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আজ রাতে।

রাবণ সেই রাজকুমার এবং সেই দৈত্যকন্যাকে হরণ করে নিয়ে এলো। মন্দোদরীকে বললো—যেন সেই যুবকটি কেটে

খুব ভালো করে তরকারী রান্না করা হয়। মহারাজ মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন।

রাবণ চলে গেলে মন্দোদরী ভাবলো মহারাজ প্রতিদিনেই তো কত নর-মাংস আহার করে আজও অন্য কোন মানুষ সংগ্রহ করে রান্না করা হবে আর এই যুবক যুবতীর মধ্যে বিয়ে হবে।

মন্দোদরী ব্রাহ্মণ এনে সেই যুবক-যুবতীর মধ্যে বিয়ের কাজ সম্পন্ন্য করলো আর অন্য নর মাংস দ্বারা রাবণের ভোজনের ব্যবস্থা করলো।

পরদিন ভোরবেলা রাবণ সেই নদীতীরে গিয়ে বিধাতাকে জিজ্ঞেস করলো—কি হে বিধাতা, তোমার বিধান অনুসারে সেই রাজকুমার আর রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছে তো?

হ্যাঁ মহারাজ।

অট্টহাসি হেসে রাবণ বললো—তোমার সেই রাজকুমার কাল খাদ্যরূপে আমার পেটে চলে গেছে।

—না। ওরা গত রাতে তোমার রাজপ্রাসাদে শুভরাত্রি পালন করেছে।

বিধাতার কথা শুনে রাবণ আবার লংকায় ফিরে এসে মন্দোদরীর মুখে সব শুনে বুঝতে পারে বিধাতার বিধান ভঙ্গ করার ক্ষমতা তার মতো ত্রিভুবন বিজয়ীরও নেই। সুতরাং মহারাজ জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, এই তিনটি কাজ দৈবের অধীন মেনে নিয়েই পথ চলা উচিত। ফুলকুমারীকে সেই সৈনিকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে যদি বিয়ে দিতে আপত্তি থাকে তা হলে তাকে ত্যাজ্য কন্যা বলে অভিহিত করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

রাণী দেবযানী এসে রাজসভায় হাজির হয়। মহারাজ ফাঁপরে পড়েন। বলেন—রাণী, তুমি রাজসভায় কেন?

- মহারাজ, ফুলকুমারী এবং তার স্বামী যাতে রাজধানীর কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে সে প্রার্থনা জানাতেই আমি এসেছি। মহারাজ, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

দেবযানী শুধু রাণীই নয় সে চন্তাই এর মেয়ে এবং বিপদের বন্ধু। তার মনে কষ্ট দেওয়ার অর্থ চন্তাইকে বিক্ষুব্ধ করা। ভাবনায় পড়েন মহারাজ। কিছুক্ষণ মাথা ন্যুয়ে চিন্তা করে তার পর বলেন—রাণী, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। তুমি প্রাসাদে যাও। তারপর দেওয়ানকে বললেন—দেওয়ান মশায় রাঙ্গামাটির বাইরে বন কুমারীর নিকট একটি গ্রাম ফুলকুমারীর নামে বন্দোবস্ত করে দিন। তারপর কিছুক্ষণ ফের চুপ থেকে রতন কুমারকে উদ্দেশ্য করে বললেন—রতন কুমার, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ফুলকুমারীকে রাজধানী থেকে বহিস্কার করা হচ্ছে। সে যাতে আর কোন দিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশাধিকার না পায় তারও ব্যবস্থা থাকবে এবার তুমি বলো তুমি ফুলকুমারীকে চাও না সেনাপতির পদ লাভ করতে চাও? তোমাকে হাজরা পদ দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম। ফুলকুমারীর সঙ্গে সম্পর্কে রাখলে সে পদেই শুধু নয়, কোন রূপ সরকারী চাকুরীর পদ তোমাকে দেওয়া হবেনা।

—মহারাজ মহানুভব। যে আমার জন্য রাজসুখ পরিত্যাগ করতে পেরেছে, জীবন বিপন্ন হওয়ার পরও যে সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে তার জন্য শুধু সরকারী চাকুরী নয় আমার জীবনও উৎসর্গ করতে পারি। মহারাজের যা অভিপ্রায় তাই করতে আজ্ঞা হউক।

—ঠিক্ আছে, তোমাদের একসঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হলো এবং এই মুহূর্তে সৈনিকের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। আর কোন দিন রাজদরবারে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। হে সভাসদগণ, আপনাদের ও আমার প্রণাম জানাই। চলো ফুলকুমারী তুমি আমার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করলে ত্রিপুরার ইতিহাসে নিশ্চয়ই তা স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। চলো।

রাজসভার বাইরে এলে হাজার হাজার জনতা রতন ও ফুলকুমারীকে দেখার জন্য রাস্তার দু-পাশে এসে জমা হলো। কেউ ফুলকুমারীর প্রেমকে ধন্যবাদ জানালো কেউ ফুলকুমারীর বুকামীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো।

ফুলকুমারী রাস্তায় পথ চলতে চলতে বললো—আর্য, আমার গায়ের যে দু-একটা অলংকার রয়েছে সেটা আমার দাদুর দেওয়া, সেগুলো বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাই দিয়ে আমরা ছোট্ট একটি ঘর তৈরী করে বাস করবো।

—তুমি কোন চিন্তা করোনা ফুলকুমারী। আমার ঘোড়াটা যে কোন রাজপুরুষের কাছে বিক্রী করে দেব। তারপর আমি কৃষি কাজ করবো। অস্ত্র রাজসভায় ত্যাগ করে এসেছি আর কোন দিন এই হাতে অস্ত্র ধারণ করবো না।

—এই ঘোড়াটা তোমার খুব প্রিয়, ওকে বিক্রী করা চলবেনা। আমার অলংকার বিক্রী করে যা পাওয়া যায় তাতেই সংসারের সব জিনিষপত্র ক্রয় করা যাবে।

দুজনে কথা বলতে বলতে বনকুমারীতে এসে পৌছে। রাজরোষের ভয়ে কেউ ওদের সঙ্গে কথাও বলতে সাহস পায়না। রতন বলে- ফুলকুমারী এ অবস্থায় এখানে না থেকে চলো আমার বাড়ী চলে যাই। সেখানে তুমি, আমি, মা আমরা সুখে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো

—আর্য, আমার পিতা মহারাজ হয়েও সত্যের প্রতি ন্যায় বিচার করেননি সে জন্য আমি রাজধানীর উপকণ্ঠে সাধারণ ভাবে জীবন কাটিয়ে অন্যায়ের মৌন প্রতিবাদ জানাবো। এখানে ছোট্ট একটা ঘর তুলে আমার স্বামীর জন্মস্থান দেখে আসবো এবং শাশুরী ঠাকুরাণীকে এখানে নিয়ে আসবো।

—তাই হউক।

পরপর তিন বৎসর অজন্মা চলছে। পানীয় জলের বড় অভাব। প্রতিদিন মহারাজের দুয়ারে অনুরোধ আসছে

পানীয় জলের ব্যবস্থা করে প্রজাদের রক্ষা করার।

রাজগুরু চিন্তিত। রাজ্যবাসীর দৃঢ় ধারণা শ্বেতহস্তী চলে যাওয়ায় রাজ্যের অমঙ্গল হয়েছে। বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর শ্বেতহস্তীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণা গৃহে মহারাজ, রাজগুরু, চন্তাই, উজীর প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণ সকলেই চুপ করে বসে আছেন। এমন খরা নাকি শত বর্ষের মধ্যেও ত্রিপুরায় হয়নি। নদীর জল স্থানে স্থানে এত কম যে গোমতীতে নৌকা চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। শুক্‌সাগরের জলও অনেক নীচে নেমে গেছে।

অবশেষে রাজগুরু বললেন—মহারাজ, অনাবৃষ্টির হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে একটি যজ্ঞ করতে হবে। আটজন চণ্ডাল যুবককে যজ্ঞে বলি প্রদান করতে হবে। আর দেবী প্রতিমা তৈরী করতে হবে স্বর্ণ দিয়ে।

—গুরুদেব, রাজধানীতেই যেমন জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও নিশ্চয়ই তেমনি হাহাকার শুরু হয়েছে। বৃষ্টি না হওয়ায় আদিবাসী প্রজাগণ তিন বছর যাবত জুম চাষ করতে পারছে না। বন আলু বাঁশ, করুলও এখন আর বনে পাওয়া যাচ্ছে না এমতাবস্থায় আপনার যা প্রয়োজন তাই যোগার করে দেওয়া হবে আপনি অনতি বিলম্বে যজ্ঞ শুরু করার ব্যবস্থা করুন। আমি কালই একমন স্বর্ণ দিয়ে দেবী প্রতীমা তৈরী করার আদেশ দেবো। দেবী মূর্ত্তি কী প্রকারের হবে, কি নাম তা আপনি বলে দেবেন।

—দেবী প্রতিমা হবে দ্বিভূজা। অলংকার শোভিতা, মুকুট ধারিণী। বাম হাতে অসি ডান হাতে বরাভয়। দেবী মূর্ত্তি হবে দণ্ডায়মানা এবং তিন হাত উচু। চোখ দুটোয় দুটো হীরে থাকবে। দেবী প্রতিমা অতি গোপণে পূজা হবে। এক-

মাত্র মহারাজ স্বয়ং এবং চন্তাই ছাড়া আর কারও দর্শনের সুযোগ থাকবেনা এমন কি রাজকুমারদেরও নয়।

দেবীর নাম হবে ভুবনেশ্বরী। মূর্ত্তি তৈরী হয়ে গেলে আমার পুজো মণ্ডপেই দেবী প্রতিষ্ঠাতা হবেন তারপর দেবীর জন্য আলাদা মন্দির তৈরী হয়ে গেলে আগামী বছর কার্ত্তিক মাসে দেবী মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা হবেন। আর প্রত্যেক সামন্ত-রাজদের আদেশ দিয়ে দিন যে যে স্থানে জল কষ্ট সেখানে যেন দীঘি খনন করা হয়। কাউকে যেন বল পূর্ব্বক খনন কার্যে নিয়োগ করা না হয়। যারা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কাজে এগিয়ে আসবে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মজুরের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে মজুরী দিয়ে যেন মজুর নিয়োগ করা হয়। শুভকার্যে বল প্রয়োগ করলে শুভফল লাভ করা যায় না।

- রাজধানীতে তো একটি বড় দীঘি রয়েছে। বনকুমারীতে আর একটি দীঘি খনন করলে কয়েক হাজার লোক উপকৃত হতে পারে। আর কৈলাগড়ের কাছে আর একটি দীঘি খনন করা প্রয়োজন। সেখানকার বাঙ্গালী প্রজাগণ খুব জল কষ্ট পাচ্ছে।

প্রহরী এসে জানালো, মহারাণী কমলাদেবী মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

প্রহরীর কথা শুনে সকলে অবাক। অবসর সময় টুকুর বেশীর ভাগ সময়ই মহারাজ কমলাদেবীর মহলে অতিবাহিত করেন কোন কিছু বলার থাকলে তখনি বলা যেতে পারে। তা হলে নিশ্চয়ই এমন কোন জরুরী খবর রয়েছে যা মহারাণী এক্ষুণি মহারাজকে না জানিয়ে শান্তি পাচ্ছেন না। মহারাজ এসব ভেবে বললেন- মহারাণীকে আসতে বলো।

মহারাণী হাতজোর করে সভার সকলকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—মহারাজ, আজ দুপুরে ঘুমিয়ে এমন এক স্বপ্ন দেখলাম যা প্রকাশ না করে আমি কিছুতেই স্বস্তিলাভ করতে পারছিনা।

ঘুম থেকে উঠে শুনলাম মহারাজ মন্ত্রণাগৃহে রয়েছেন। আমার স্বপ্নটা সকলেরই শোনা প্রয়োজন মনে করায় মন্ত্রনাগৃহে ছুটে এসেছি। মহারাজের অনুমতি পেলে প্রকাশ করতে পারি। —অনুমতি দেওয়া হলো।

মহারাজ, স্বপ্ন দেখলাম এক দেবী মূর্ত্তি। চারহাত বিশিষ্ট সিংহ বাহিনী। ত্রিনেত্র। লাল জিহ্বা ত্রিশূল এবং খরগ ধারিণী। সিংহের পদতলে প্রকাণ্ড শিব লিঙ্গ। দেবী আমাকে অভয় দিয়ে বলছেন এই মূর্ত্তিতে আমাকে কৈলাগড়ে প্রতিষ্ঠা কর। রাজ্যের মঙ্গল হবে। মহারাজ দেখলাম সেখানে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুবিশাল দীঘি খনন করা হয়েছে। আমি তৈল-সিন্দুর দিয়ে দীঘিতে গঙ্গা দেবীর পূজো দিয়েছি। পূজোর পর কল কল ধ্বনিতে পাতাল থেকে জল উঠে দীঘির পাড় ছাপিয়ে দিয়েছে। মহারাজ এই আমার স্বপ্ন, এবার আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন।

রাজগুরু বললেন - মহারাজ, মহাদেবী উত্তম স্বপ্ন দেখেছেন। দেবী কালিকা স্বয়ং মহাদেবীকে দর্শন দিয়েছেন। কৈলাগড়ে দেবী কালিকা এবং রাজধানীতে দেবী ভুবনেশ্বরী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করুন। আগে দেবী ভুবনেশ্বরীর প্রতিমা তৈরী করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করি। আর পাথরে খোদাই করে নির্মান করা হবে দেবী কালিকার মূর্ত্তি। স্বপ্নে যেই রূপে দর্শন দিয়েছেন সে ভাবেই নির্মিত হবে। ভাস্কর শিল্পী এনে অনতিবিলম্বে মূর্ত্তি নির্মানের আদেশ প্রদান করা হউক। শক্তি পূজো সম্পন্ন হলে মহারাজ রাজ্য বিস্তারের ব্যবস্থা করুন। মহারাজ অবশ্যই সফল কাম হবেন।

ভুবনেশ্বরী মন্দির এবং কৈলাগড়ে কালিকা মন্দির তৈরীর কথা শুনে বহু সম্পন্ন প্রজা সেচ্ছায় সরকারী কোষাগারে অর্থ দান করতে লাগলো। গত তিন বছর অধিকাংশ অংশেই রাজস্ব

আদায় বন্ধ থাকায় সরকারী কোষাগারে অর্থের অভাব দেখা দিয়েছিল। প্রজাগণ নিজেরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করায় মন্দির তৈরীতে অর্থের কোন অভাব রইলো না। মহারাজ স্বঃস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন।

১৪৯১ খৃঃ অগ্রহায়ণ মাসের অমবস্যা তিথিতে দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজোর আয়োজন করা হয়। রাজগুরু বললেন—সভাসদগণ, শুধুমাত্র আজ প্রকাশ্যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারপর দেবীর নিত্য পূজোর ব্যবস্থা হবে। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার পর দেবী মূর্ত্তিতে সত্যি সত্যি প্রাণের সঞ্চার হলো কিনা মূর্ত্তির নাকের সামনে তুলা রেখে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে আট জন চণ্ডাল যুবককে যোগার করা হয়েছে দেবীর সামনে বলি দেওয়ার জন্যে। বলির পাঠার মতোই গোমতী নদী থেকে ওদের স্নান করিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে দু-হাত পেছনে করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওদের চোখ মুখ লাল। দেখে বুঝা যায় হয়তো একসময় প্রচুর কেঁদেছে তারপর ওদের কান্না থেমে গেছে। রাজ শক্তির কাছে ব্যক্তি শক্তির কোন মূল্য নেই। যে রাজা প্রজা রক্ষা করেন তিনি স্বয়ং বলি দেওয়ার জন্য ওদের সংগ্রহ করেছেন। ওরা কার কাছে প্রার্থনা জানাবে?

রাজ গুরু মন্ত্র পড়ে মন্ত্রপুতঃ জল ওদের মাথায় ও শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—চণ্ডাল যুবকগণ, আজ তোমাদের জন্ম সার্থক হলো। তোমাদের চণ্ডাল দেহ দেবী পূজোয় উৎসর্গীকৃত হচ্ছে এর চাইতে আর আনন্দের কি হতে পারে। তোমরা যদি দেবীর কাছে তোমাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করো দেবী তা হলে আর ও বেশী খুশী হবেন।

একজন চণ্ডাল যুবক বললো—পুরোহিত মশায়, আমরা প্রার্থনা করি আর না-ই করি আমাদের রক্তেতো দেবীর পূজো

হচ্ছেই। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দিতে আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আমাদের বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসার সময় আমাদের পরিবারের অবস্থাও বিবেচনা করা উচিত। আমাদের সকলের সংসারেই নিত্য অনটন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবন রক্ষা করতে হয়। আমাদের অবর্তমানে আমাদের সংসারের ভরন পোষণের ভার যদি মহারাজ গ্রহণ করতে রাজী থাকেন তাহলে মরতে আমাদের দুঃখ থাকবেনা। নইলে আমাদের পরিবারের সদস্যদের কাতর চিৎকার নিমেষে যজ্ঞ ফলকে পণ্ড করে দেবে।

রাজগুরু বললেন—তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ করা হবে। তোমাদের জীবনের বিনিময়ে তোমাদের স্ত্রী ও আত্মীয়দের হাতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হবে। সেই অর্থের বিনিময়ে তোমাদের আত্মীয় পরিজন জীবন ধারণ করতে সক্ষম হবে। আমি দেবীর কাছে তোমাদের মুক্তি কামনা করছি। তোমাদের আত্মার সদ্‌গতি হউক।

উচু বেদীর উপর দেবীর স্বালংকারা স্বর্ণ মূর্ত্তি ভাস্কর হয়ে উঠেছে। রাজধানীর মানুষ দেবী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রাসাদে ভেঙ্গে পড়েছে। যারা ভীরের জন্য পুজো দেখা থেকে বঞ্চিত হলো তারা অনুশোচনায় ভুগছে।

রাজ গুরু মন্ত্রদ্বারা দেবী মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মহারাজ চন্তাই এবং কয়েকজন প্রধান রাজ পুরুষকে আহ্বান করলেন মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা তা পরখ করে দেখার জন্য।

মহারাজ তার পারিষদবর্গ নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাজগুরু মূর্ত্তির নাকের কাছে তুলা ধরলেন। সকলেই দেখতে পেলেন তুলা নড়ছে। মহারাজ স্বয়ং উচ্চ স্বরে বললেন—দেবী ভুবনেশ্বরী কি জয়. জয়। মহারাজের স্বরের সঙ্গে উপস্থিত সকলেই স্বর মেলালো।

দেবী ভুবনেশ্বরীর জয় ধ্বনিতে রাজপ্রসাদ মুখরিত হয়ে

উঠলো। একশত আটটি ঢাকের মিলিত আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগার হলো আর এই জয় ধ্বনির মাঝেই আট চণ্ডাল যুবকের মুণ্ডহীন মৃতদেহ গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

ফুলকুমারী আর রতন সিং দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বনকুমারীতে একটি আশ্রমের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রতন কুমার নিজের হাতে লাঙ্গল চাষ করে ফসল ফলায়। সন্ধ্যার পর কখনো কখনো নিজেদের তৈরী ফুল বাগানে গিয়ে বসে।

বনকুমারীতে বিশাল দীঘির খনন কাজ শুরু হয়েছে। আয়তনে ধন্য সাগরের মতো না হলেও কাছাকাছি। দীঘির তলায় চলে গেছে ফুলকুমারীকে দেওয়া কিছু জমি।

রতন বললো—ফুলকুমারী, তুমি দেওয়ান মশায়ের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জানাও। মহারাজ স্বয়ং তোমাকে যে জমি দিয়েছেন তা তিনি না জানিয়ে ফেরত নেবেন কেন? কাজ এ ভাবে চলতে থাকলে আমাদের এত কষ্টে গড়ে তোলা ফুলের বাগানটিও ধ্বংস হবে। এমনিতেই বাগানের উত্তর দিকের বেড়া কয়েক স্থানে ভেঙ্গে ফেলেছে। শেষে আমাদের বাগানও বিনষ্ট হবে।

ফুলকুমারী দেওয়ানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—দেওয়ান কাকা, যে জমি আমাকে দেওয়া হয়েছে সে জায়গা আমাকে না জানিয়ে কেন দখল করা হচ্ছে?

ফুলকুমারীর কথা শুনে দেওয়ান বললেন—রাজকন্যা, এই দীঘি খনন করা হলে কয়েক হাজার লোক উপকৃত হবেন, তোমরাও উপকৃত হবে। আর তুমি মহারাজের আদরের মেয়ে তাই সামান্য কারণে তোমার পিতা অর্থাৎ মহারাজের কাজের সমালোচনা করবে ভাবতে পারিনি। তোমার কিছু ধানের জমি নেওয়া হয়েছে বটে তবে আমরা চেষ্টা করছি কাছাকাছি অন্য

কোথাও তোমাকে নূতন বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়ার। তোমাকে একটি গ্রাম দেওয়া হয়েছে, তেমোকে কোন করও দিতে হবেনা পক্ষান্তরে এই গ্রামের বাসিন্দাগণ তোমাদের যে উৎপাদিত ফসলের অংশ দেবে তাতে তোমরা সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করতে পারো। কিন্তু, তোমরা তা না করে নিজেরা এমন পরিশ্রম করে মহারাজকে লজ্জা দিচ্ছ কেন ?

—কাকা, আমি আর রাজনন্দিনী নই, বাবা আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আমার স্বামীরও সরকারী চাকুরী নেই। আর আমার স্বামী চাইছেন নিজের পরিশ্রমের উপর বেঁচে থাকতে। প্রজাগণ দয়া করে আমাদের ফসলের অংশ দেবে আর আমরা সেই আশায় চেয়ে থাকবো এটা আমরা চাইনা। দীঘির জলে হাজারো মানুষের উপকার হবে সত্য কিন্তু, আমার সেরা কৃষি জমি দীঘির তলে তলিয়ে গেল। মাটি ফেলে আমার ফুলের বাগান ও নষ্ট করে ফেলছে। আমরা এদিকটায় খনন কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি। আপনি দয়া করে মহারাজকে বলে দীঘির মাটিতে যাতে আমার বাগান নষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করুন।

— কাজ বন্ধ করা উচিত হয়নি। আমি মহারাজের কাছে লোক পাঠাচ্ছি, দেখি কি হয়। —ফুলকুমারী দেওয়ানের কাছ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে যে রতন সিং এর বাধা দানে পুকুরের খনন কাজ বন্ধ আছে।

খবর শুনে মহারাজ অত্যন্ত রেগে গেলেন। যেখানে একটি দিন একটি বৎসর সেখানে কাজ বন্ধ করা। এতবড় সাহস ?

দূত বললো—মহারাজ; রাজকুমারীর কিছু ধানের জমি পড়েছে। তা ছাড়া উনি যে বাগান করেছেন সে বাগানের

অংশে মাটি রাখার ব্যবস্থা না করা হলে মাটি নিয়ে অনেক দূর ফেলতে হবে তাতে কাজে বিলম্ব হবে।

মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে দূতকে বললেন—তুমি গিয়ে নাজির মশায়কে বলো—ফুলকুমারীর স্বামীকে যেন জিজ্ঞেস করে মাটি কোথায় ফেলা হবে। ওদের অন্য কোন জায়গায় নূতন জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে দেব। দীঘির খনন কার্য যেন বন্ধ না রাখা হয়। যদি ফুল বাগানের ক্ষতি পূরণ দিতে হয় রাজকোষ থেকে ক্ষতি পূরণের অর্থ ও প্রদান করা হবে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে খনন কার্যে অংশ নিয়েছে সেখানে সামান্য একটি বাগানের জন্য সময় নষ্ট করা চলবেনা।

দূত এসে নাজিরকে মহারাজের সিদ্ধান্তের কথা জানালে মহারাজ রতন সিংকে বললেন—জামাই মশায়, মহারাজ বাগানের ক্ষতি পূরণ করতে রাজী আছেন। তুমি আদেশ দিলে শ্রমিকরা কাজ শুরু করতে পারে।

— উজীর মশায়, দীঘির কাজ কিছু উত্তর থেকে শুরু করলেই আমার বাগান ও জমি নষ্ট হতোনা। মহারাজ চাননা আমরা বনকুমারী থাকি। তাই এমনটা হয়েছে। আমার বাগান নষ্ট করতে দেওয়া হবেনা, আমার প্রাণ থাকতে নয়। আপনারা অন্যত্র মাটি ফেলার ব্যবস্থা করুন।

—জামাই বাবাজী, একটু বিবেচনা করো। হাজার হাজার লোককে বসিয়ে রাখা কি উচিত? মহারাজ তো বলেছেন সব ক্ষতিই পূরণ করে দেবেন। দূরে মাটি ফেলতে অনেক সময় লেগে যাবে। তুমি অবুঝ হইও না বাবা।

—হু! মহারাজ তার কন্যাকে ত্যাগ করেছেন, আমাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছেন আর এখন বলছেন বাগানের ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। আসলে এত সুন্দর বাগান দেখে

মহারাজ ইর্ষাবশতঃ আমার বাগান ধ্বংস করতে এখানে দীঘির কাজ শুরু করেছেন। আবার আমায় বলছেন বিবেচনা করতে। আমাদের বিপদে ফেলার একটা কৌশল মাত্র।

—তুমি মহারাজকে অযথা দোষ দিচ্ছ। হাজার হাজার লোক খনন কার্যে অংশ নিয়েছে। ওরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দীঘির আয়তন বড় করে ফেলেছে। তুমি এখানে মাটি ফেলতে না দিলে খনন কার্যে বিলম্ব হবে আর হাজার হাজার মানুষ তোমাদের উপর বিরক্ত হবে।

—হাজার হাজার মানুষ দেখেছে কী অমানুষিক পরিশ্রম করে হাজারো ফুলের শোভায় বাগানকে শোভিত করে তুলেছি। আপনারা দয়া করে দীঘির আয়তন এদিকে না বাড়ালে কারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবেনা। ফুলকুমারীর অতি সাধের ফুলের বাগান নষ্ট করা হলে ও আর বাঁচবে না।

—ঠিক্ আছে আমি মহারাজের কাছে আবার লোক পাঠাচ্ছি। মহারাজ যা বলেন তাই হবে।

মহারাজ খেতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দূত উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ রেগে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা আমায় খাওয়ার সুযোগও দেবেনা?

—অপরাধ ক্ষমা করুন মহারাজ। উজীর মশায় বলেছেন যে ভাবেই হউক খবরটা আপনাকে জানাতে। দীঘির খনন কার্য বন্ধ। জামাই মশায় বাগানে মাটি ফেলতে দিচ্ছে না। বাগানে বসে আছে।

মহারাজ রাগে ফেটে পড়েন। বলেন—এত করে বলার পরও যদি সে রাজী না হয় তা হলে তার উপরই মাটি ফেলো। যে মেয়েকে ত্যাগ করেছি তার জন্য আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। উজীর মশায়কে বলে দাও কাজ যেন এক মুহূর্তও বন্ধ না রাখা হয়।

উজীর মশায় দূতের কাছে খবর পেয়ে আবার রতনকে অনুরোধ করে এখান থেকে ঘরে যেতে। কিন্তু, রতন কিছুতেই রাজী হয়না। তখন উজীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রমিকদের বলেন —বন্ধুগণ, প্রায় অর্দ্ধেক দিন আমাদের কাজ বন্ধ রইলো। আমরা আর কাজ বন্ধ রাখবো না। জামাই মশায় যদি না সরে তা হলে তার উপরই মাটি ফেলা হউক এটাই মহারাজের আদেশ।

শ্রমিকগণ আবার প্রবল উৎসাহে কাজ শুরু করলো। প্রায় হাজারো টুকরি মাটি পড়লো রতনের মাথায়, গায়ে। রতন মাথা গুঁজে বসে রইলো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রতনের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেলো।

ফুলকুমারী দেওয়ানের কাছ থেকে ফিরে এসে খবর শুনে পাগল হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ মাটির উপর উথাল পাতাল করলো। করিমের মা সাহসে ভর করে ফুলকুমারীকে সান্তনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করলো।

তিনটি বছর কেটেছে বিয়ের পর। মা কিংবা চন্তাই বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন আসেনি মূহুর্তের জন্য ও ফুলকুমারীকে শান্তনা দিতে, ফুলকুমারীর খোঁজ নিতে। গ্রামের মানুষ মাঝে মধ্যে আসতো ফসলের ভাগ দিতে কিন্তু. ফুলকুমারী এবং তার স্বামী ফসলের ভাগ নিতে রাজী না হওয়ায় প্রতিবেসীরাও কেউ আসে না। রতন সিং এর বৃদ্ধা মা ই দিলো একমাত্র শান্তনার স্থল। বহুভাবে রাজদুহিতাকে শান্তি দিয়ে, স্নেহ দিয়ে আত্মীয় স্বজনের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। সেই বৃদ্ধা শাশুরীও গত হয়েছেন প্রায় এক বৎসর হলো। কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় ফুলবাগানের মাঝেই কাটিয়ে দিতো দিনের অনেকটা সময়। সেই বাগানও নেই, নেই তিন বছরের সুখ দুঃখের সঙ্গীও।

শোকে পাথর হয়ে যায় ফুলকুমারী। ঘরের দরজায় পাথরের স্তূপায় বসে বাগানের শেষ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করলো। সূর্য্য পশ্চিমে চলে পড়লো। শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করলো। ফুলকুমারী এগিয়ে চললো গোমতীর দিকে গোমতীর কোলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য।

'একমাত্র মেয়ের শোকে আধ পাগল হয়ে যায় দেবযানী। চন্তাই, মহারাজ দু-জনেই দেবযানীকে শান্তনা দেয়। তবুও দেবযানী প্রতিদিন সকালে এসে ফুলকুমারীর জন্য ফুলকুমারীর সমাধীতে এসে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে যায়। মেয়ের আত্মার শান্তি কামনা করে।

দীঘির খনন কাজ শেষ হয়। শেষ হয় মন্দিরের কাজ ও। রাজ বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে নির্মিত হয় ভুবনেশ্বরী মন্দির। ভুবনেশ্বরীর স্বর্ণ প্রতিমা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনসাধারণ শেষ বারের মতো দেবী-ভুবনেশ্বরীর দর্শণ লাভের সুযোগ পায়।

কৈলাগড়ের পাশে যে বিশাল দীঘি খনন করা হয় তাতে জলের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। একই সময়ে কাজ শুরু করে মাত্র পাঁচ হাত খনন করতেই বনকুমারীর দীঘি জলে পূর্ণ হয়ে গেছে আর কৈলারগড়ের দীঘিতে পঁচিশ হাত খনন করার পরও জলের হদিশ পাওয়া যাচ্ছেনা। মহারাজ চিন্তিত, খনন কারীরা নিরাশ।

মহারাণী কমলাদেবী আবার স্বপ্ন দেখলেন সর্বালংকারে ভূষিতা মকর বাহিনী একদেবী মূর্ত্তি এসে বলছেন—দীঘির ভেতর গঙ্গাপুজো দিতে বল। গঙ্গা পুজো শেষ হলে তুই তৈল সিঁদুর দিয়ে আমায় আহ্বান করবি, আমি আসব। —মহারাণীর মন আনন্দে ভরে উঠে।

ত্রিপুরায় কোন দীঘি এত গভীর করা হয়নি, করা যায়নি,

তার আগেই জলে দীঘি পূর্ণ হয়ে—উঠেছে আর কৈলাগড়ের দীঘি পঁচিশ হাত খননের পরও জলের দেখা নেই। মহারাজ তাই বিমর্ষ হয়ে গুরু দেবের পরামর্শ চাইলেন, কোন যাগ-যজ্ঞ করলে যদি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু. গুরুদেবও সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। কমলাদেবী সেই অস্বস্থি থেকে উভয়কে রেহাই দিলেন। বললেন—গুরুদেব গতরাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। দেবী বলেছেন দীঘির মাঝখানে যেন গঙ্গা পূজা দেওয়া হয় এবং পূজোর পর আমি যেন তৈল সিঁদুর দিয়ে দেবীকে আহ্বান করি। এতেই জল উঠবে।

গুরুদেব গণনা করে শুভ-সময় ঠিক্ করলেন। বললেন—আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিন দিবা আট ঘটিকায় পুজো শুরু হবে। মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে আগামী শুভ নববর্ষে।

হাতীতে চড়ে মহারাজ ও মহারাণী বহু বিশিষ্ঠ রাজকর্মচারী সহ উপস্থিত হলেন কৈলাগড়। পুরোহিত পুজো শুরু করলেন। হাজার হাজার স্ত্রীলোকের মিলিত উলুধ্বনিতে এক অপূর্ব-মুর্ছনার সৃষ্টি হলো। আর কি আশ্চর্য! সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ঈশাণ কোনে এক খণ্ড কালো মেঘ দীঘির দিকেই যেন মৃদু গতিতে এগিয়ে আসছে।

সখীগণ সহ কমলাদেবী পুজোর স্থানে গেলেন। তৈল সিঁদুর দিয়ে দেবীকে হাতজোর করে আহ্বান করলেন। বললেন—হে দেবী, তোমার সম্মান তুমি রক্ষা করো। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভরিয়ে দাও অতল স্পর্শী দীঘি। মানুষের মন চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত। তুমি সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করো।

আকাশে মেঘ গর্জন করতে লাগলো। ছুটে এলো কৈলা-গড়ের দিকে। দীঘির স্থানে স্থানে দেখা দিলো জলের রেখা। কোথাও কোথাও ফোয়াবার মতো জল উঠতে লাগলো।

কমলাদেবী খুশীতে বালিকার মতো জলে ছুটে গিয়ে ফোয়ারার জলে স্নান করতে লাগলেন। আকাশ ভরে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়লেন কমলাদেবী দীঘির মাঝখানে। মহারাজ ভয়ে ছুটে গেলেন দীঘির মধ্যে। দীঘিতে তখন হাঁটু জল। কমলাদেবীর কোন হুঁস নেই। তখনো বৃষ্টি ভেজার আনন্দে মত্ত। মহারাজের ডাকে হুঁস হলো। পাড়ে যখন এসে পেঁৗছলেন তখন গলা জল। দীঘির চার পাশে হাজার হাজার দর্শনার্থী আনন্দে মগ্ন।

লক্ষীনারায়ণের মন্দিরটি পছন্দ হয়নি রাজগুরুর। কমলা সাগরের খননের পর রাজগুরু বললেন —মহারাজ, রত্নপুরে একটি লক্ষী-নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবার চন্দ্রপুরেও একটি রাধা-কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হউক। প্রজাদের তাহলে বিষ্ণু মন্দিরে পূজো দেওয়ার জন্য রাজধানীতে ছুটে আসতে হবেনা। মনে হয় এবার দেবী প্রসন্ন হয়েছেন। এবার ত্রিপুরার মাঘ মাসের শেষে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। কথায় আছে "যদি বৃষ্টি হয় মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুন্যি দেশ"। বৈশাখের অক্ষয় তৃতিয়াতে চন্দ্রপুরে রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হউক। মন্দিরের পাশেই রয়েছে সুবিশাল শুক সাগর। শুক-সাগরের নৈস সৈন্দর্য্য মন্দিরের পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

—চন্দ্রপুরের কোথায় মন্দির তৈরী হবে তা তো ঠিক্ করতে হবে।

—স্থান নির্বাচন হয়ে গেছে। শুক সাগরের পূর্ব দিকের যে টিলার উপর ছোট্ট একটি কালি মন্দির রয়েছে তার পাশেই নির্মিত হবে রাধাকৃষ্ণ মন্দির। দেব মন্দির নির্মানের যে লক্ষন উল্লেখ রয়েছে সে স্থানটি সবদিক দিয়েই উৎকৃষ্টতম। যে গৃহস্থ

সেখানে দেবীর ছোট্ট কুটির নির্মান করে পুজো করছে তাকে অনুরোধ জানানো হউক সেই দেবীমূর্ত্তি যেন মহারাজকে দান করে দেয়। তা হলে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটি মন্দির তুলে সেখানে ঐ দেবী প্রতিমা স্থাপন করা হবে। এতে বৈষ্ণবগণ এবং শক্তিগণ উভয়েই খুশী হবেন। আসলে কালি হচ্ছে পরম বৈষ্ণবী। কৃষ্ণ ভাবনা করতে করতেই তিনি কৃষ্ণ বর্ণা হয়েছেন। "কৃষ্ণ ভাবনয়া শশ্বত কৃষ্ণ বর্ণা সনাতনি"।

চন্তাই বললেন—মহারাজ; ধর্মকর্ম তো একেবারে কম হয়নি কিন্তু, একটা জিনিষ বাদ রয়ে গেছে সেটা হলো তীর্থ ভ্রমন। কিন্তু, পার্শ্বস্থ রাজগণ যেভাবে ত্রিপুরা জয়ের জন্য উৎপেতে আছে সে জন্য আপনার ত্রিপুরার বাইরে কোন দূরবর্ত্তী তীর্থে যাওয়ার বিপদ রয়েছে। ত্রিপুরায় সে দুটো মহান তীর্থ রয়েছে তার একটিতে গিয়ে কিছুদিন বাস করে আসুন। ঊনকোটি আর ডুম্বুর তীর্থের মধ্যে ডুম্বুর তীর্থে বাস করাই অনেকাংশে সুখপ্রদ এবং নিরাপদ হবে।

রাজগুরু বললেন—মহারাজ, চন্তাই ঠাকুর উত্তম প্রস্তাব করেছেন। ডুম্বুর তীর্থ রাজধানীর অনতি দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াতেরও বেশ সুবিধে তাছাড়া শুনেছি ডুম্বুর তীর্থে মহাদেবের পদ চিহ্ন রয়েছে। চন্তাই ঠাকুর, আপনি ডুম্বুর তীর্থ সম্পর্কে কিছু বলুন।

—শুনেছি সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন মহাদেবীকে কাঁধে করে ত্রিভুবন ঘুরছিলেন তখন তিনি ত্রিপুরায় এসে ছিলেন। শোনা যায় মহাদেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলী ত্রিপুরায় পড়েছে। অনেকে অনুমান করেন চন্দ্রপুরে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে কালী পূজা হচ্ছে সেখানেই নাকি সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়েছে। হয়তো কোন কালে এখানে মন্দির ছিল, তীর্থ স্থান ছিলো কালক্রমে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

চন্তাই ঠাকুর, আমি সপরিবারে ডুম্বুর তীর্থের যাবো। যেখানে মহাদেবের পদচিহ্ন রয়েছে। তার পাশেই তাবু ফেলে সাতদিন বাস করবো আপনি এবং গুরুদেব দিন ঠিক করে আমায় বলুন, আমি প্রস্তুত হই।

রাজ পরিবারের সকলেই দু একবার করে ডুম্বুর তীর্থ দর্শন করেছে এবার রাজকীয় মর্যাদায়। মহারাজের সঙ্গে তীর্থ দর্শকের খবরে রাজ পরিবারের সকলেই আনন্দিত।

রাতে মহারাজ কমলাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন মহারানী. ডুম্বুর তীর্থে হাতীতে চড়ে যাবে, না নৌকায় যাবে? —

মহারাজ, নৌকায় নদীর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। আমরা নৌকায় যেতে আগ্রহী। মহারাজের আপত্তি না থাকলে সে মতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

—তোমার কথা মতোই ব্যবস্থা করা হবে। গুরুদেব বলেছেন—আগামী শুক্রবারে ভালো দিন রয়েছে সে দিনই যেন তীর্থ যাত্রার আয়োজন করা হয়। গুরুদেবের কথানুযায়ীই ব্যবস্থা হচ্ছে। বসন্তকালে নদীর হিমেল হাওয়ায় সূর্য্যের প্রখরতা মিষ্টি লাগবে।

পাঁচটি সুদৃশ্য বজরায় রাজ পরিবার যাত্রা করে ডুম্বুর তীর্থের উদ্দেশ্য।

সারাদিন নৌকা চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এক স্থানে এসে মহারাজ বিশ্রামের ও রাত যাপণের আদেশ দিলেন। রাজ পরিবার ও সৈন্যদের আপ্যায়ণের জন্য ব্যবসায়ীগণ একটি অস্থায়ী বাজার বসান। বাজারে যার যার উত্তম দ্রব্যাদি নিয়ে এসে পসরা সাজায়। কমলাদেবী যেমন সখীদের নিয়ে বাজার ঘুরতে বের হন তেমনি মহারাজও অমাত্যদের নিয়ে বাজার দেখতে যান। মহারাজ এবং মহারাণী উভয়েই বেশ কিছু জিনিষ দ্বিগুণ দাম দিয়ে ক্রয় করেন। ফেরার পথেও এই

স্থানে এসে আবার রাত্রি যাপনের কথা বলেন। ফলে ব্যবসায়ীগণ মহারাজের ফেরা পর্যন্ত দোকানপাট সাজিয়ে রাখতে তৎপর হয়। বাজারটির নাম হয় নূতন বাজার।

রাইমা ও সরমা নদীর মিলিত স্থান থেকে গো-মুখ পর্যন্ত স্থানের মাঝামাঝি বেশ কয়েকটি কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। আর গো-মুখের সু-উচ্চ স্থান থেকে পতিত জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্টি হয়েছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নয়নাভিরাম কুণ্ড।

দু-দিকে সু-উচ্চ পাহাড়। পাহাড় ঢালু হতে হতে দুটো কালো বৃহৎ পাথরের স্তুপ। আর স্তুপের মাঝখান চিড়ে পুণ্যতোয়া গোমতী সবেগে ধেয়ে চলেছে সাগরে মিলিত হওয়ার বাসনা নিয়ে। পাথর দুটো দেখলে হঠাৎ মনে হয় একটি গরু যেন হাঁ করে আছে আর গরুর মুখ দিয়ে সবেগে জল স্রোত ভেসে আসছে। অনেকে তাই এ স্থানকে গো-মুখ বলেন। আর গো-মুখ দিয়ে প্রবাহিত বলে এই নদীর নাম গো-মতি।

মহারাজ সমস্ত কুণ্ডগুলোর নামাকরণ করলেন। গো-মুখ স্থানের সর্ব বৃহৎ নয়নাভিরাম কুণ্ডটির নাম রাখলেন কমলাকুণ্ড। গো-মুখ থেকে রাইমা সরমার মিলিত স্থান পর্যন্ত আর যে পাঁচটি কুণ্ড রয়েছে সেগুলোর নান রাখলেন যথাক্রমে—দেবযানি কুণ্ড, প্রমিলা কুণ্ড, অর্চনা কুণ্ড, নির্মলা কুণ্ড ও লক্ষী কুণ্ড।

গো-মুখের দক্ষিণ দিকের যে বিশাল পাথরটি রয়েছে তার উপরে একটি বিশাল পদচিহ্ন। চন্তাই বললেন—মহারাজ, আদিকাল ধরে পাহাড়ী প্রজাগণ এই পদচিহ্নকে শিব পদচিহ্নরূপে পূজো করে আসছেন। আপনিও পূজো করুন।

চন্তাই এর কথানুযায়ী মহারাজ পতিত পাবনী গঙ্গারূপী গোমতীতে স্নান করে পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন তারপর মহাদেবের চরণ বন্দনা করলেন।

আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সাতদিন ডুম্বুরতীর্থে কাটিয়ে মহারাজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। তার মন, সকলের মন, আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো।

রাজসভা চলছে। প্রহরী এসে জানালো এক পরদেশী ব্রাহ্মন মহারাজের দর্শন প্রার্থী। ব্রাহ্মণ শুনে মহারাজ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে রাজসভায় আসার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ লম্বা গৌর বর্ণ এবং ক্ষীণদেহী। চন্তাই এবং রাজগুরু ছাড়া রাজসভার উপস্থিত সকলেই মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকে হাত জোর করে প্রণাম জানিয়ে সম্মান জানালো। ব্রাহ্মণ বললেন—মহারাজ, আমি ত্রিহুত থেকে এসেছি। শুনেছি একজন গায়ক ও নৃত্য শিল্পী ত্রিহুত থেকে এসে মহারাজের রাজসভায় স্থান পেয়েছে। আমি একজন কবি, পূজো আর্চা ও করি। আমারও ইচ্ছে মহারাজের কৃপায় আমার কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটুক।

—ত্রিহুত থেকে কয়েকজন শিল্পীকে আমি রাজসভায় স্থান দিয়েছিলাম কিন্তু, যিনি রাজকুমারীদের নাচ গান শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি রাজকুমারীদের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার কিছুদিন পর ত্রিপুরা ত্যাগ করেছেন। ত্রিহুতের কয়েকজন লোক অবশ্য এখনো রয়েছেন। তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নাচ গান শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। আপনি আজ বিশ্রাম করুন কাল আপনার সঙ্গে ত্রিহুতবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে আর আপনার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে রাজসভাকে আনন্দিত করবেন।

মিথিলা, ত্রিহুত প্রভৃতি প্রদেশের কয়েকজন গুণি লোক ত্রিপুরায় থেকে নাচ গানের তালিম দিচ্ছিলেন মহারাজ রাজধানীতেই তাদের থাকা খাওয়ার সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিমাসে ভালো মাসোহারা প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রাজসভায় প্রবাসীদের খবর দিয়ে আনানো হলো। উজীর মশায় শিল্পীদের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি ভেবেছিলেন ত্রিহুতের যারা এখানে রয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ না কেউ পরিচিত থাকবে, কিন্তু, তা হলো না। মহারাজ বললেন—কবি, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। পরিচিত না হলেও ওরাও আপনার দেশবাসী। আমি আপনাকে কবি হিসেবে রাজসভায় স্থান দিলাম। গুরুদেবের কাছে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছি। আপনি কী রচনা করতে চান বলুন?

—মহারাজ, আমি দুটো কাব্য রচনায় হাত দিয়েছি, শেষ কবে হবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনার আনুকূল্য পেলে আমি সেই গ্রন্থ দুটো পর্যায়ক্রমে শেষ করতে পারি। একটা হচ্ছে উৎকল খণ্ড পাচাঁলী। এতে উৎকল রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবমন্দির বিশেষ করে জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করা হবে। অন্যটি হবে রত্নাকর নিধি, এতে বিভিন্ন পুরাণের সুন্দর সুন্দর কাহিনীর উল্লেখ থাকবে।

—ত্রিপুরার শিক্ষিত লোকের অধিকাংশই বাঙ্গালী। ত্রিপুরার রাজভাষাও বাংলা। সুতরাং আপনার গ্রন্থের ভাষাও বাংলাই হতে হবে। তাহলে ত্রিপুরায় আপনার কাব্য প্রচারিত ও সমাদৃত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে।

—আমি বাংলাতেই গ্রন্থ রচনা করবো।

—উজীর মশায়, কবির থাকা খাওয়া এবং মাসোহারার বন্দোবস্ত করুন। আপনার যেদিন খুশী রাজসভায় এসে আপনার কাব্য পাঠ করে আমাদের শুনিয়ে যাবেন। কোন অসুবিধা হলে উজীর মশায় এর কাছে সরাসরি চলে আসবেন।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

রাজসাগরের পাশে সুন্দর একটি দালান বাড়ীতে কবির থাকার বন্দোবস্ত হলো। কবি প্রতিদিন ভোরবেলা গোমতী

নদীতে স্নান সেরে, গোপাল পুজো সেরে কাব্য রচনা করতে বসেন। একজন বাঙ্গালী পরিচারক ঘরের যাবতীয় কাজ করে দেয়, ব্রাহ্মণ দুপুরে নিজে রান্না করেন। তারপর গোপালের কাছে ভোগ লাগিয়ে নিজেও প্রসাদ পায়, পরিচারকও প্রসাদ পায়।

কয়েকদিন পর পাশের এক দালান থেকে সুন্দরী মেয়েলী গলার সুর ভেসে আসছিলো। ভজন গান। বাংলাতে নয় উর্দু গানের কলি ভেসে আসছে।

গান শুনে থমকে যায় কবির লেখনি, কান পেতে শুনতে থাকেন। পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞেস করেন— হ্যাঁরে, কে গাইছে ?

—একজন বাঈজি। পনর-বিশ বছর আগে ঢাকা থেকে রাজা-মটি আসে। এখন কোন জলসায় আর নাচ-গান করে না, মাঝে মাঝে বাড়ীতে বসে গান গায়। শুনেছি এক সময় নাচে-গানে স্বয়ং মহারাজকেও মাতিয়ে রেখেছিল।

তালপাতাগুলি গুছিয়ে বেঁধে রেখে উঠে পড়ে ব্রাহ্মণ। ধীর পদক্ষেপে গিয়ে ঢুকে বাঈজীর ঘরে। প্রহরী ব্রাহ্মণকে চেনে, তাই প্রবেশপথে বাধার সৃষ্টি করেনি। ব্রাহ্মণও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে, কারও অনুমতি না নিয়ে গানের আওয়াজ লক্ষ্য করে সোজা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

ব্রাহ্মণের গায়ে সামান্য একটু বস্ত্র খণ্ড। পরণেও এক খণ্ড সাদা কাপড়। খালি পা। সামান্য আগে এই বস্ত্রবাস পরে গোপাল পুজো দিয়ে উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচনায় বসেছিল। করমা বাঈ এর ভক্তির কথাই লিখছিল।

বাঈজীর এত রূপ! এই রূপে একদা স্বয়ং মহারাজও পাগল ছিল। হয়তো সে রূপে প্রচণ্ড উগ্রতা ছিল। আজকের

রূপে রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ রূপ। গন্ধরাজের উগ্র গন্ধ নয়। চুপ চাপ মেঝেয় গালিচায় বসে তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলো। আর রোশনারা বাঈও চোখ বুজে তানপুরায় কোমল হাতের পরশে সুরের ঝংকার তুলে তন্ময় হয়ে গাইছিল তাই আগন্তুকের উপস্থিতি টের পায়নি।

রোশনারা গান শেষ হলে চোখ মেলে শুদ্ধ সত্ব এক ব্রাহ্মণ কবিকে পাশে বসে থাকতে দেখে অবাক্ হলো। ক্ষণিকের জন্য বাক্শক্তিও যেন হারিয়ে ফেললো। ব্রাহ্মণেরও স্বল্পবাস বাঈ-জীবও স্বল্পবাস। যে বছরের পর বছর স্বল্পবাসে রাজপুরুষদের নিজের দেহের প্রতি আকৃষ্ট করে এসেছে আজ সে লজ্জিত। সংকোচেব সঙ্গে বললো—আমি বাঈজী, তাও আবার মুসলমান। আপনি ব্রাহ্মণ! আমার ঘরে এসে আপনি আপনার ক্ষতি করবেন না ব্রাহ্মণ! হিন্দুরা আপনাকে একঘরে করবে। আপনি মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে ফিরে যান। দোহাই আপনার, নিজের সর্বনাশ করবেন না।

বাঈজীর কথায় বাস্তবে নেমে আসে ব্রাহ্মণ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—তুমি কী গাইছিলে? হে খোদা, হে আল্লা, জগতের যা কিছু সবই তো তোমার, কী দিয়ে তোমার আরাধনা করবো, কী দেবার আছে তোমায়? বাঈজী, তোমার নাম জানিনা, জাত জানিনা, তোমার রূপ যৌবন নিয়েও চিন্তা করিনি! শুধু ভেবেছি যে সর্ব শক্তিমানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করে ঈশ্বরের আরাধনা করছে তার কোন জাত পাত বিচারের প্রয়োজন নেই। সে সমাজের নমস্ত। আমার ভাব রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

—অপরাধ নেবেন না ব্রাহ্মণ, আমার হারানোর কিছু নেই কিন্তু, আপানার আছে। আমি আপনার জন্যই বলছি।

বাঈজী, আমি এক কাব্য রচনায় হাত দিয়েছি। যার

কথা এখন লিখছি সেও একজন বাঈজী। যৌবনে রূপ ও গানের জৌলসে রাজপুরুষদের মাতিয়ে রেখেছিল। প্রৌর বয়সে এসে ঈশ্বরের কাছে সব সমর্পণ করে ভোরবেলা ঈশ্বরকে গান শোনাত। সেও ছিল মুসলমান তালিম নিয়েছিল এক রাজপুত রমনীর কাছে। রাজপুত রমনীর এক বাল-গোপাল ছিল। সেই রমনী দেহত্যাগ করার পর সেই করমা বাঈ বাল-গোপালের ভোগ লাগাত। স্বয়ং জগন্নাথ বালক বেশে উপস্থিত হয়ে বাঈজীর গান শুনতেন এবং খেয়ে যেতেন।

—তিনি খুব ভাগ্যবতী ছিলেন তাই ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছেন। আমার নাম রোশনারা। লোকে আমায় রোশনি-বাঈ বলে ডাকে। এই গরীব খানায় স্বয়ং মহারাজ সহ বহু রাজপুরুষের পদধূলি পড়েছে। এসেছে আমায় দেখতে, গান শুনতে, দেহকে ভোগ করতে। আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আপনি কেন আমার এখানে এসে আপনার পূন্যকে বিসর্জন দেবেন?

—রোশনারা বাঈ, পাপ-পুন্য সম্বন্ধে চুল-চেরা বিচার আমি কখনো করিনি.। তোমার গান শুনে করমাবাঈ এর জীবনী লিখতে লিখতে মনে হলো করমাবাঈকে হয় তো তোমার মাঝে দেখতে পাবো তাই ছুটে এলাম।

—আমার অপরাধ নেবেন না, না বুঝে অন্যের সঙ্গে আপনাকে তুলনা করার মানসিক চেষ্টা করেছি। আপনি মেহেরবানী করে আসনে বসুন, আপনাকে প্রণাম করি। আমি মুসলমানের মেয়ে হলেও তালিম নিয়েছি এক হিন্দু রমণীর কাছ থেকে। নাম লক্ষ্মীবাঈ। বাঈজীর এখানে কি মুখ মিঠা করতে আপত্তি আছে?

—রোশনারা, আগেই বলেছি তোমার অতিতকে নিয়ে বিচার করার প্রয়োজন আমার নেই। তোমার মাঝে যে

সুর-সাধিকার জন্ম হয়েছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার হাতের মিঠাই আমার কাছে প্রসাদ। তুমি নিয়ে এসো।

রোশনারা ভেতরে গিয়ে চাদরে গা ঢেকে থালায় করে কিছু ছানার মিষ্টি আর রূপোর গ্লাসে করে জল নিয়ে এলো। ব্রাহ্মণ সেগুলি খেয়ে বললেন—খুব তৃপ্তি পেলাম। তোমার গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে যদি কথনো কথনো চলে আসি তাহলে আমায় ভুল বুঝনা যেন।

—আপনি মেহেরবানী করে আসলে আমি অবশ্যই খুশী হবো আপনার কাব্যও শুনতে পারবো।

বহু বছর বহু রাত শুধু যশ, খ্যাতি, অর্থের জন্য গেয়েছি। এখন নিজের জন্য গাই।' আল্লার কাছে পূর্বের অপরাধের জন্য দোয়া মাগি। আপনার মতো ভক্ত ও কবি যদি অধীনের গান শুনতে আসেন তবে ধন্য মনে করবো। কিন্তু, ভয় হয়, পাছে জনরোষ আপনার অশান্তির কারণ হয়!

রোশনারাবাঈ এর সঙ্গে ব্রাহ্মণের পরিচয় ব্রাহ্মণের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। ব্রাহ্মণের মনে হলো উৎকল খণ্ড পাচাঁলীর যে অংশ রচিত রয়েছে তাতে সব কিছুই রয়েছে শুধু মাধুর্য নেই। রোশনারার সঙ্গে পরিচয়ের পর আবার পাচাঁলী নূতন করে লিখতে শুরু করলো। রোশনারা তার পাচাঁলীর কল্পণা, রোশনারা তার পাচাঁলীর প্রেরণা। রোশনারাই কাব্যের, মাধুর্য স্বরূপ।

নিজের মনেই ভাবে, রজকিনীকে না পেলে চণ্ডীদাশ যেমন শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তণ রচনা করতে পারতেন না, পদ্মাবতীকে না পেলে যেমন জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনা করতে পারতেন না, চিন্তাকে না পেলে যেমন বিল্বমঙ্গল তার কাব্য রচনা করতে পারতেন না। কাব্যে মধুর রসের সৃষ্টি করতে পারতেন না তেমনি তার পাচাঁলী রোশনারার অভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

পাচাঁলী রচনা করে আগে শোনায় রোশনারাকে তারপর রাজদরবারে। রাজদরবারের গুণীজন এমন কি মহারাজ স্বয়ং। পাচাঁলীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু, গুরুদেবের মনে একটু বিরক্তি। একজন বাঈজীর ঘরে দিনের পর দিন এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে পড়ে থাকবেন তা হতে দেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণ হয়ে আর এক ব্রাহ্মণের অধঃপতন কিছুতেই নিরবে মেনে নেওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ পদ রচনা করেন রোশনারা তাতে সুর দেন। গান গেয়ে ব্রাহ্মণকে শোনায়। নিজের রচনায় এমন মধুর সুর সৃষ্টি হয়েছে! শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণ নিজেই তন্ময় হয়ে যায়।

এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এবং এক প্রৌঢ় বাঈজীর প্রেম কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফাঁকে এক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং রোশনার ঐকান্তিক সেবা ও অনুপ্রেরণায় রচিত হয় উৎকল খণ্ড পাঁচালী এবং রত্নাকর নিধি।

রাজসভায় প্রতিদিন কিছু কিছু করে পাঠ করে শোনায় ব্রাহ্মণ। রোশনার আরোপিত সুরে-ই পরিবেশন করেন তার কাব্যের মাধুরী। রাজা ও রাজসভা মুগ্ধ হয়। তবুও কাব্য পাঠের আসর শেষ হলে একদিন উজীর মশায় বললেন—কবি, আপনার রচনা অতি উৎকৃষ্ট মানের হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, আমরা আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত! মহারাজ স্বয়ং আপনার উপর ক্রুদ্ধ। একজন বাঈজীর পাল্লায় পড়ে আপনার কাব্য প্রতিভাকে নষ্ট করবেন না।

উজীরের কথায় বিস্মিত ব্রাহ্মণ। বলেন—উজীর মশায়, আমার সৃষ্টির প্রশংসার অধিকারী সেই বাঈজী! তাকে কল্পনা করেই আমার সৃষ্টি। সে ছাড়া আমার কোন সৃষ্টিই সম্ভব নয়। আপনারা দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না।

—ব্রাহ্মণ, আপনার জন্য রাজধানীর গন্যমান্য ব্যক্তিই ক্রুদ্ধ এবং লজ্জিত। ক্রুদ্ধ আমাদের রাজগুরু এবং চন্তাই স্বয়ং। আপনি বাঈজীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে আপনাদের উভয়েরই বিপদ হবে।

—আমি কুলকুমারীর কথা শুনেছি। তার প্রাণরক্ষাকারীকে বিবাহ করে মহারাজের ক্রোধের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কুলকুমারীর ভালবাসাতেও দৈহিক আকর্ষণ মুখ্য ছিলনা। মুখ্য ছিল কৃতজ্ঞতা। আমাদের মধ্যেও দৈহিক সম্পর্ক কোন ব্যাপার নয়, ঈশ্বরের আরাধনায় আমরা একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

—ব্রাহ্মণ, সাবধান! আমাদের মহারাজের ন্যায় বিচার নিয়ে কোন ইঙ্গিত দেবেন না। যদি ভালো চান বাঈজীর সঙ্গে সম্পর্ক চ্ছেদ করুন, নয় তো ত্রিপুরা ত্যাগ করুন, অন্যথায় বিপদ অনিবার্য।

পরদিন থেকে রোশনারা এবং কবিকে রাজধানীর কোথাও দেখা গেলোনা। কয়েকদিন রাজধানীর মানুষ উভয়ের চরিত্রে কলংক আরোপ করে সমালোচনায় মুখর হলো। রাজসভায় কবির মহান কাব্য পাঠ বন্ধ করে দেওয়া হলো। জন সাধারণ ক্রমে ভুলে গেলো সেই কবি ও তার সৃষ্টিকে। হায়রে ভাগ্য!

কমলা সাগর দীঘির উদ্বোধন হয়ে গেছে। দীঘির পাশে কালী মূর্ত্তি প্রতিমার জন্য মন্দিরও তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু, দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি।

মহারাণী কমলাদেবী স্বপ্নে দেখেছিলেন—দেবী মূর্ত্তি হবে চতুর্ভূজা, সিংহবাহিনী, নীচে থাকবে শিবলিঙ্গ। কিন্তু, শিল্পী মূর্ত্তি গড়ার সময় গড়ে ফেলেন দশভূজা, সিংহ বাহিনী মহিষাসুর মর্দিনীর মূর্ত্তি।

শিল্পীর দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ার মুখে। রাণী বিষণ্ণ। রাজাও দুঃখিত। একদিন রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—মহারাজ, শিল্পী আমার ইচ্ছেতেই সিংহ বাহিনী, মহিষাসুর মর্দিনীর মূর্ত্তি তৈরী করেছে। আমাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজো দাও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

স্বপ্ন দেখে মহারাজ উল্লসিত। শিল্পী আনন্দিত, আনন্দিত মহারাণী। মহা ধূম ধাম করে ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে নরবলি দিয়ে শক্তি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো। পণ্ডিত মণ্ডলী বিচার করে সিদ্ধান্ত দিলেন মূর্ত্তি সিংক বাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী হলেও যেহেতু শিবলিঙ্গরূপী শিব পদতলে রয়েছে সেহেতু কালীকা রূপেই এই দেবী পূজো পেয়ে থাকবেন।

মহারাজ ঘোষণা করলেন—যেহেতু নববর্ষে দীঘির উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ভাদ্র মাসে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেহেতু নববর্ষ এবং ভাদ্র মাসের অমাবস্যা এই দু-তিথিতে মায়ের মন্দিরের সামনে এবং দীঘির পাড়ে প্রতি বৎসর মেলা বসবে। মেলাতে যেসব জিনিষ অবিক্রীত থাকবে সরকার সে সব জিনিষ ক্রয় করবেন যাতে ব্যবসায়ীগণকে ক্ষতির মধ্যে পড়তে না হয়।

তিনদিন মেলায় অতিবাহিত করে মহারাজ স্বপার্ষদ ফিরে এলেন রাজধানীতে। তার পরদিন যথারিতি রাজসভা বসলো। প্রধান সেনাপতি বললেন—মহারাজ, কয়েক বৎসরের শাসনে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছে। কয়েক বৎসর আগে যুবরাজ স্বয়ং মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, খণ্ডল প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। সে সমস্ত রাজগণ এখন মহারাজের আনুগত্য মেনে চলেছে। এবার উত্তর দিকে এবং দক্ষিণে চট্টগ্রাম অভিযানে সৈন্য পাঠানো উচিত।

উজীর ও প্রধান সেনাপতির কথায় সায় দিয়ে বলেন—মহারাজ, খাদ্যে রাজ্য এখন স্বয়ম্ভর, গত বছর ফসল খুব ভালো হয়েছে। এ বৎসর পাহাড়ে জুম ফসলও খুব ভালো হয়েছে। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আমিও একমত। এ বৎসর সমর অভিযান শুরু করা হউক।

মহারাজ বললেন—আপনারা দু-জনেই যখন একমত তখন আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। দেবকুমার যাবে উত্তরে আর রায় কাচাগ ও রায় কসম যাবে চট্টগ্রাম অভিযানে। যুবরাজের সঙ্গে প্রধান সেনাপতি মশায় স্বয়ং যাবেন। যুবরাজকে অভিযানের প্রধান নায়ক মনোনীত করলাম। তবে যুবরাজ প্রয়োজন বোধে প্রধান সেনাপতি মশায়ের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবেন কিংবা প্রয়োজনে প্রধান সেনাপতি মশায় স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে যুবরাজকে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। আর চট্টগ্রাম অভিযানে প্রধান নায়কের দায়িত্ব পালন করবেন সেনাপতি রায়কাচাগ মশায়। চন্তাই এবং গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করে আপনারা যাত্রা করুন। আমার সৈন্য সংখ্যার অর্দ্ধেক যাবে চট্টগ্রাম বিজয়ে, এক ভাগ যাবে উত্তরে আর এক ভাগ রাজধানীতে থাকবে।

১৪২২ শকাব্দে (১৫০০খৃঃ) দেওয়ালী উৎসবের পর ত্রিপুর সৈন্য দু ভাগে ভাগ হয়ে সমর অভিযানে বের হয়।

যুবরাজ দেবকুমার প্রধান সেনাপতি সহ কিল্লা আমপাশা মনু, কৈলাহ.র কিরাত রাজ্য থানাংচ প্রদেশে গিয়ে বেজুরা, বরদাখাত, ভানুগাছি আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে আর রায় কাচাগ গর্জি, পিলাক, বংকুল হয়ে রামগড়ে গিয়ে চট্টগ্রাম অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

শ্রীহট্টের মত জাতির সাধারণ পাহাড়ী প্রজাও জুম চাষ নির্ভর। মাঘ মাসের পরই তারা জঙ্গল পরিস্কার করে জুমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকে। অনিয়মিত সৈন্যরাও সে

সময় নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে জুম চাষে ব্যস্ত থাকে। রায় কাচাগ অংক কষে দেখে সে সময় অর্থাৎ চৈত্র মাসে চট্টগ্রাম আক্রমণ করলে সুবিধে। আরাকান রাজ তখন সৈন্য সংগ্রহ করতেই বিপাকে পড়বে। আর যারা যুদ্ধে আসবে তাদের মন থাকবে জুম ফসলের দিকে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে পারবে না।

রায় কাচাগ তার সেনা বাহিনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে সাব্রুম, পিলাক, কলসী খণ্ডল প্রভৃতি প্রদেশে পাঠিয়ে দিলো যাতে আরাকান রাজ বুঝতে না পারে যে ত্রিপুর সৈন্য আরাকান জয়ের উদ্দেশ্যে এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

আরাকান রাজের কাছে খবর যায়। আরাকান রাজ খবর নিয়ে জানতে পারেন ত্রিপুর সৈন্যের সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী নয়। এত স্বল্প সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করতে এসেছে এ কথা আরাকান রাজের বিশ্বাস হয় না।

১৫০১ খৃঃ চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। রায় কাচাগ তার সমস্ত সৈন্যদের রায়গড়ে নিয়ে আসলে তারপর আরাকান আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্র করলেন চট্টগ্রামের রসাঙ্গ নামক স্থানের কাছাকাছি পেঁছতেই ত্রিপুর সৈন্য আরাকানের সৈন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি হলো।

আরাকান রাজ জানতেন ত্রিপুর সৈন্যের সংখ্যা বড়জোর পনর হাজার হতে পারে কিন্তু, সমর ক্ষেত্রে এসে জানতে পারলেন ত্রিপুর সৈন্যের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। তার মধ্যে পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশত অশ্বারোহীও রয়েছে।

আরাকানের দূত আরাকান রাজ্যের প্রামে প্রান্তরে ছুটে গেলো অনিয়মিত সৈন্যদের যোগাড় করতে। তারা তখন জুমের কাজে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করেছে। রাজ্য রক্ষার চেয়ে ফসল রক্ষাতেই মনযোগ অধিক।

ত্রিপুর সৈন্য ইচ্ছে করেই ঢিমে তালে আক্রমন চালালো। জুম এখনো মাটির সঙ্গে কথা বলছে। পুরুষেরা কিছুটা কাজ মুক্ত। মাস খানিক পর যখন ফসল কাটার সময় হবে তখন ফসলের মায়ায় বহু সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকবে। তখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমন করলে আরাকান রাজ সন্ধি করতে বাধ্য হবেন।

প্রতিদিন দু-পক্ষের সৈন্যই কিছু পরিমানে আহত এবং নিহত হতে থাকে। আরাকান রাজের পক্ষ থেকে যেমন তীব্র আক্রমনের অনীহা তেমনি ত্রিপুর সৈন্যের পক্ষেও অনীহা।

তিনমাস যাবত ঢিমেতালে যুদ্ধ চলে। আরাকান রাজ ভাবেন ফসল উঠে গেলে, খাবার গোলায় এসে গেলে তীব্র ভাবে আক্রমণ করে ত্রিপুর সেনা হটিয়ে দেওয়া যাবে আর রায়কাচাগ ভাবেন ফসল তোলার প্রাক্ মুহুর্তে তীব্র আক্রমন করে আরাকানকে পরাভূত করা হবে।

আষাঢ় মাস। কয়েকদিন যাবত প্রচণ্ড বৃষ্টি। নদীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জুমের ধান দু-একটা করে পাকতে শুরু করেছে। আর ক'দিন পরেই জুমের ধান তোলা যাবে।

নিশীথ রাতে বৃষ্টি মাথায় করে ত্রিপুর সৈন্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অবস্থায় আরাকান শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ, আগে কয়েক শত মোষের শিং এর সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল বেঁধে দিয়ে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাড়া খেয়ে এবং মশালের আঁচে মোষগুলো দলবদ্ধ ভাবে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। আরাকানের প্রহরীরা ভাবলো বৃষ্টি মাথায় করে ত্রিপুরসেনা পালিয়ে যাচ্ছে।

মোষের দল মশাল মাথায় পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে আর পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুর সৈন্য। সামনে একটি পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখানে একটি কালী মন্দির। মন্দিরে কয়েকজন

প্রহরী কিছুক্ষণ আগেও প্রহরায় ছিল। ত্রিপুর সৈন্য চলে গেছে মনে করে তারা ঘুম দিয়েছে আর বৃষ্টিতে ঘুমের আমেজে একেবারে হত চেতন।

রায় কাচাগ কয়েকজন বিশ্বস্থ সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে উপরে উঠে ঝটিকা আক্রমন করে ঘুমন্ত প্রহরীদের খুন করলো। তারা অনেকেই চিৎকার দেবারও সুযোগ পেলো না।

রায় কাচাগ মন্দিরের দরজা খুলেই অবাক্ হলো দেখলো শ্যামলা একটি মেয়ে মন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তাকে সকলেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রায় কাচাগ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে ?

— এই মন্দিরের দেবী। আমাকে পুজো দিয়ে তারপর যুদ্ধে যা, তোদের মঙ্গল হবে।

এক মুহূর্তও এখন অনেক মূল্যবান। তাই রায়কাচাগ বললেন—মা, শত্রু টের পাওয়ার আগেই আক্রমন না করলে আমাদের বিপদ হবে। যদি যুদ্ধে জয়ী হই আর জীবিত থাকি তা হলে যাবার সময় তোমার পুজো দেব। তুমি আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের যাবার অনুমতি দাও।

—ঠিক্ আছে, যাবার সময় পুজো দিস। তোদের মঙ্গল হউক।

রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার ত্রিপুর সৈন্য আরাকানের শিবির আক্রমন করে। আকস্মিক আক্রমনে আরাকানের সৈন্যরা হত বিহ্বল। ঘুম থেকে উঠে অনেকেই অস্ত্র ধারণের সুযোগ পেলনা। আরাকানরাজ অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। রাতের যুদ্ধে বুদ্ধির লড়াইএ রসাঙ্গের যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যের জয় হলো।

রাত প্রভাত হলো। ত্রিপুর সৈন্যরা বিজয়উল্লাস করতে

করতে এগিয়ে চলেছে এমন সময় আরাকানের দূত এলো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

ত্রিপুর সৈন্য ছাউনি ফেললো। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করলো। গত রাত্রের অনিদ্রায় সবাই ক্লান্ত, বহু লোক আহত। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল ত্রিপুর সৈন্যের।

রায়কাচাগ দূতকে বললো— আরাকান রাজকে বলুন যদি রসাঙ্গ প্রদেশ ত্রিপুরাকে ছাড়তে রাজী হয় তাহলেই সন্ধি হতে পারে। নয় তো ত্রিপুর সৈন্য এগিয়ে যাবে। আর রাজী হলে মহারাজের জন্য যেন কিছু ভেট্ প্রদান করা হয়।

আরাকানের দূত চলে গেলো। রায়কাচাগ সৈন্যদের ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন পাহাড়ের উপর তাবু ফেলে প্রহরায় থাকতে নির্দেশ দিলেন। যাতে শত্রু কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় নিতে না পারে। কিন্তু, তার প্রয়োজন হলো না। মগরাজ স্বয়ং ভেট্ নিয়ে পরদিন হাজির হয়ে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করলেন।

দুপুরে একশো আটটি ছাগ এবং আটটি মোষ বলি দিয়ে দেবীর পূজা দিলেন। দূত পাঠানো হলো রাজধানীতে বিজয় বার্তা শোনানোর জন্য। ত্রিপুর সৈন্যরা উৎসবে মেতে উঠলো।

রায়কাচাগ সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললো বন্ধুগণ আমরা এসেছি যুদ্ধ করে রাজ্য জয় করতে। শত্রুপক্ষ আজ যতই সন্ধি করলেও এ সন্ধি বেশী দিন বজায় থাকবে না। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ্ চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারে সর্বদাই সচেষ্ট। আমাদের তাই সর্বদা সাবধানে থাকতে হবে। আমি পারিহাম লস্করকে রসাঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করছি। পারিহাম বীর যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি রসাঙ্গের মানুষের মন জয় করে ত্রিপুরার বিজয়পতাকা সর্বদাই উঁচুতে তুলে রাখতে সক্ষম হবেন। আমি শীগগীরই রাজধানীতে ফিরে যাবো। পাঁচ হাজার সৈন্য থাকবে লস্কর মশায়ের সঙ্গে। কোন অসুবিধে হলে

আমি আবার আসবো! আজ দুপুরে চট্টেশ্বরী মন্দিরে যাবো পূজো দিতে। আপনারা সাবধান থাকবেন।

চট্টেশ্বরী মন্দিরে বলি ও পূজো দিয়ে এক সপ্তাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে রসাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে রায়কাচাগ স্ব-সৈন্যে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

যুবরাজ দেবকুমার শ্রীহট্টের পাশাপাশি অঞ্চল বেজুরা, ভানুগাছি, লঙ্গলা জয় করে যে সব অঞ্চলে ত্রিপুরার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে ইতি মধ্যেই রাজধানীতে ফিরে এসেছে। দক্ষিণেও ত্রিপুর সৈন্যের সামরিক সাফল্যে সকলেই আনন্দিত। রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা জানানো হলো রসাঙ্গ বিজয়ী রায়কাচাগকে। রসাঙ্গ মর্দন নারায়ণ উপাধীতে ভূষিত করা হলো তাকে।

রাত্রিতে মহারাজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—এক চর্তুভূজা অপরূপ সুন্দরী নারী মূর্তি মহারাজকে বলছেন—মহারাজ, কাছেই চট্টেশ্বরী থাকায় আমায় খুব একটা সমাদর কেউ করে না। চন্দ্রপুরে রাধাকৃষ্ণের যে মন্দির তৈরী করছো সে মন্দিরে আমায় প্রতিষ্ঠা করো। রায়কাচাগের পূজোয় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের কল্যাণ হউক।

"চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট
প্রস্তরেতে আছি আমি আমার প্রকট
তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর সেইমতে ভজ" (রাজমালা)

পরদিন রাজ সভায় মহারাজ রায়কাচাগকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোন মন্দিরে পূজো দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ মহারাজ। অবসর সময়ে আপনাকে বলবো বলে ভেবেছিলাম! রসাঙ্গ যুদ্ধের প্রাক্কালে দেবী স্বয়ং দেখা দিয়ে পূজোর জন্য বলেছিলেন। তার কৃপাতেই যে যুদ্ধে জয় হয়েছে এবং আরাকান রাজের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে এ বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ শেষে এক দেবীর মন্দিরে পূজো দিয়েছি। কয়েক মাইল দূরে চট্টেশ্বরীরও পূজো দিয়েছি। শুনেছি চট্টেশ্বরী মন্দিরেই ভক্তের সমাগম খুব বেশী হয়। এই মন্দিরে ভক্তের আগমন কদাচিত ঘটে। এমনিতেই মন্দিরটি নির্জন অবস্থিত তার উপর উচু টিলার উপর মন্দিরটি স্থাপিত হওয়ায় মহিলা পূণ্যার্থীরা খুব কম আসে। চতুর্ভূজা কালী মূর্ত্তি। স্বয়ং বালিকা বেশে দেখা দিয়ে জীবন ধন্য করেছেন।

—গতরাতে সেই দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন তাকে এনে নির্ম্মিয়মান রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

—আমারও মনে মনে একান্ত ইচ্ছে ছিল মা কে ত্রিপুরায় নিয়ে আসি। মা নিজেই আসতে চাইছেন এ তো বড়ো আনন্দের কথা। মা খুবই জাগ্রত। মায়ের আগমনে ত্রিপুরা তীর্থস্থানে পরিণত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

—তাহলে আপনাকেই আবার কষ্ট করে রসাঙ্গ যেতে হবে। হাতীর পিঠে তুলে মা কে নিয়ে আসবেন।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমি কালই আবার যাত্রা করবো। আমার মন যে মায়ের দর্শন আকাংখায় সদা উন্মুখ।

—আমাদের সভা আপনাকে রসাঙ্গ মর্দ্দন নারায়ণ উপাধীতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের প্রধান সেনাপতি মাননীয় দৈত্য নারায়ণ মশায় বয়সের আধিক্য হেতু অবসর নিতে চাইছেন। আজ আপনাকে অভিষিক্ত করা হচ্ছে। ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি পদেও আশা করি আপনার শৌর্য, বীর্য দ্বারা ত্রিপুরার সুনাম আরও বাড়িয়ে তুলবেন। সেই সঙ্গে আপনাকে পঁচিশটি গ্রাম দেওয়া হচ্ছে। আপনি এবং আপনার উত্তরাধীকারীরা বংশ পরম্পরায় সে স্থান ভোগ দখল করবেন।

—মহারাজের দেওয়া গুরু দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে

আপ্রাণ চেষ্টা করবো। মহারাজের আদেশ পেলে কাল প্রত্যুষে আমি রসাঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করবো।

—আগামী অমাবস্যায় যাতে মাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি সে চেষ্টা অবশ্যই করবেন।

রাজ পরিবারের পাট হাতীকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তার পিঠে সুদৃশ্য গদি পেতে দেওয়া হলো। সঙ্গে চললেন চন্তাই এবং রাজগুরু। অন্য হাতীতে চড়ে রায় কাচাগ এবং রাজকুমার ধ্বজ। সঙ্গে একশত অশ্বারোহী।

তিনদিনে গিয়ে ওরা হাজির হলেন রসাঙ্গ। দেবী মূর্তি দেখে সকলেই আনন্দিত! ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে আবার আনন্দের সাড়া পড়লো। আরাকান রাজার কাছে দেবী প্রতিমা নিয়ে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন।

আরাকান রাজের অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হিন্দু প্রজাও রয়েছে কিছু। তারাও প্রায় সবাই চত্রেশ্বরী মন্দিরে পূজো দিতে যায়। দু-জন পুরোহিত এবং কয়েকজন সেবকই দেবীর নিত্যপূজো সম্পন্ন করেন। সরকার থেকে তাদের মাসোহারা—দেওয়া হয়। তাছাড়া যখন যে ভক্ত মন্দিরে যা উৎসর্গ করেন এবং দান করেন পুরোহিত এবং সেবকগণ তা ভাগ করে নেন। কাজেই দেবী মূর্তি ত্রিপুরায় নিয়ে আসার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হলেন না। দেবীর প্রাতঃ ভোগের পর মন্দিরের পুরোহিত, সেবক সকলেই দেবীর সঙ্গে ত্রিপুরায় যাত্রা করেন। যাবার পথে সময় লেগেছিল তিনদিন আর ফেরার পথে মাত্র একদিন একরাত্র। চন্দ্রপুর যখন এসে পৌঁছলেন তখন প্রভাতের প্রাক্ সময়।

মন্দির সম্পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে দেবী পুরনো দেবী মূর্তির পাশেই স্থান পেয়ে পূজো পেতে লাগলেন। পূজোর ভার

দেওয়া হলো দেবীর সঙ্গে আগত পুরোহিতদ্বয় এবং মিথিলার দু-জন ব্রাহ্মণকে সমবেত ভাবে।

১৫০১ খৃঃ (১৪২৩ শকাঃ) কার্ত্তিক অমাবস্যা তিথিতে মহা ধূমধাম করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হলো। পাশেই স্থান পেলেন অনাদিকাল থেকে পূজিতা প্রস্তর মূর্ত্তির কালী দেবী। রসাঙ্গ থেকে আগত দেবীর নামাকরণ করা হলো— শ্রীশ্রীত্রিপুরেশ্বরী। মন্দিরের আয়তন হলো চব্বিশ ফুট ও চব্বিশ ফুট। পরিসর ষোল ফুট ও ষোল ফুট। দেওয়াল —আট ফুট।

মহারাজের সাইত্রিশ বৎসর রাজত্বকাল শেষ হয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মহারাজ বাংলার কিয়দংশ, চট্টগ্রামের কিয়দংশ এবং শ্রীহট্টের কিয়দংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ত্রিপুরার প্রজাবৃন্দও মহারাজের সুশাসনে খুশী। ফুলকুমারীর কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছে। ভুলে গেছে বিখ্যাত বাঈজী ও কবির কথা।

রাজগুরু বললেন—মহারাজ, শক্তি প্রতিষ্ঠা করলে ভৈরবেরও প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আপনি কৈলাগড়ে মহাশক্তি সর্বমঙ্গলা চন্দ্রপুরে কালীকা, রাজধানীতে ভুবনেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার রত্নপুরে লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরের পাশে দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মহা ভৈরবকে স্থাপন করুন। মাটি পাথর সংগ্রহ করে শিব লিঙ্গ তৈরী করার ব্যবস্থা করুন।

যুবরাজ দেবকুমার বললো মহারাজ, উত্তর ত্রিপুরা অভিযানে গিয়ে লোক মুখে শুনেছি কিরাত রাজ্যে কোন এক স্থানে এক অদ্ভুত শিবলিঙ্গ রয়েছে। আকারে শিবলিঙ্গটি প্রায় অর্দ্ধফুট। কিন্তু, এর গুণ নাকি অপরিসীম। এর স্পর্শে নাকি লোহা স্বর্ণে পরিণত হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ

প্রয়োজনে কিরাতরাজ লিঙ্গ পরশ করে লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করেন। একদা মহারাজকে আমি এ কথা বলেছিলাম কিন্তু, মহারাজ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। আমিও প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করতে পারিনি পরে খবর নিয়ে জেনেছি খবরটি সত্য। স্বয়ং কিরাতরাজ এবং মহামন্ত্রী ছাড়া কেউ লিঙ্গ দর্শনের অধিকারী নয়। মহারাজ যদি কিরাত রাজের কাছে দূত পাঠিয়ে শিবলিঙ্গটি যাচনা করেন কিরাতরাজ তা না দিয়ে পারবেন না।

—এমন একটা কথা আমিও শুনেছি বটে, তবে গুরুত্ব দেই নি। তুমি যখন নিশ্চিত তখন আমার জামাতা হোপাকুলাউ যাবে শিবলিঙ্গটি নিয়ে আসতে। যদি প্রয়োজন হয় তবে বল প্রয়োগ করবে। আর কয়েকজন ভাস্কর শিল্পীকে ভার দেওয়া হউক বৃহদাকৃতি এক শিবলিঙ্গ তৈরী করতে। কিরাতরাজ থেকে যে শিব লিঙ্গ আনা হবে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা হবে আর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পাশে তৈরী হবে আলাদা শিব মন্দির।

মহারাজের আদেশ মতো পাঁচ হাজার ত্রিপুর সৈন্য নিয়ে হোপাকুলাউ যাত্রা করে কিরাত রাজ্যের [illegible] শিবলিঙ্গ নিয়ে আসার জন্য।

কিরাত রাজের কাছে খবর যায়। কিরাতরাজ প্রমাদ গুণে। প্রিয় দেবতাকে কাছ ছাড়া করতে প্রাণে বাঁধে। অথচ এমন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে দেবতাকে রক্ষা করতে পারে।

মহামন্ত্রী কিরাতরাজকে সান্ত্বনা দেয়। বলে- মহারাজ, দেবতাই মানুষকে রক্ষা করেন, মানুষ দেবতাকে রক্ষা করেন এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি। মহাদেব স্বয়ং যদি কৃপা করে যান তবেই ত্রিপুররাজ এই লিঙ্গ নিয়ে যেতে পারবে, নয় তো ব্যর্থ হবে। আপনি মহাদেবের কৃপা প্রার্থনা করুন।

রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে। খবর যায়, মহারাজের জামাতা এসেছেন শিবলিঙ্গ নিয়ে যেতে। রাজা মন্ত্রীকে বলেন—মন্ত্রী মশায়, আপনি গিয়ে রাজ-জামাতাকে আদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করুন। বলবেন—প্রাণের দেবতাকে আমি বিদায় দিতে পারবো না বলে রাজ-জামাতার সঙ্গে দেখাও করতে পারলাম না। মহাদেবের যখন আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তখন আমি কী করতে পারি?

—মহারাজ, শ্বেতহস্তী গনেশকুমারকে নিয়েও ত্রিপুররাজ রাখতে পারেন নি, শিবকে নিয়েও রাখতে পারবেন না। তা ছাড়া রাজ্যের অতি প্রয়োজন ছাড়া কখনো আমরা সোনা তৈরী করিনি কিন্তু, মহারাজ ধন্যমাণিক্য অবশ্যই লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক পরিমাণে সোনা তৈরীতে সচেষ্ট হবেন তখন মহাদেব কুপিত হয়ে ত্রিপুরের মতো ধন্যমাণিক্যকেও বধ করবেন। আমি যাই, রাজ-জামাতার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি।

রাজ-জামাতা হোপাকুলাউ এর আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হলো না। মন্ত্রী তাকে জানালেন মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ তাই তিনি মহামান্য অতিথির সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। অতিথি যেন সেটা ক্ষমার চোখে দেখেন। এবং এই শিবলিঙ্গ মহারাজের প্রাণ। প্রাণ চলে গেলে দেহের যে অবস্থা হয়, মহারাজেরও সে দশা হয়েছে।

হোপাকুলাউ বললো—মন্ত্রী, এখানে শিবঠাকুরের দর্শন আপনারা দু-একজন ছাড়া কেউ পান না আর সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ঠাকুরের দর্শন লাভ করে নিজেদের ধন্য করবে। এতে তো কিরাত রাজের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিরাতরাজকে আমার প্রণাম জানাবেন আর শিবলিঙ্গের পূজক যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তবে যেতে পারেন। আমরা তাঁর যথাযত ব্যবস্থা করবো।

—মহারাজ নিজে এই লিঙ্গের পূজো করতেন। আপনাদের যাত্রা শুভ হউক।

হোপাক্ লাউ সসৈন্যে শিব লিঙ্গ নিয়ে যাত্রা করে। হোপাক্ লাউ জানে এই লিঙ্গ অতি মূল্যবান। এর স্পর্শে লোহা সোনা হয়। তাই অতি গোপনে প্রথমে রৌপ্য পেটিকায় পরে বড় তামার বাক্সে ঢুকিয়ে ভালো করে বাক্স তালা বন্ধ করে অতি সতর্ক ভাবে সেই বাক্সকে সুরক্ষিত করে চলতে থাকে।

মনু নদীর তীরে এসে তাবু ফেলে ত্রিপুর বাহিনী। এখানে রাত কাটিয়ে তার পরদিন ভোরবেলা আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

ভোরবেলা ব্রাহ্মণ মনু নদীতে স্নান সেরে জল নিয়ে আসে শিবের পূজো দেওয়ার জন্য। তাবুর ভেতরে বাক্স খোলা হয়। প্রথমে তামার বাক্স তারপর রূপোর বাক্স কিন্তু, কোথায় শিব লিঙ্গ! হোপাক্ লাউ অবাক এবং ভীত। সঙ্গীরা বিস্মিত। মহাদেব অন্তর্দ্ধান করেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন --রাজ জামাতা, কিরাতরাজ নিশ্চয়ই শিব ভক্ত। ভগবান ভক্তকে ত্যাগ করে কখনো যান না, তাই আবার ভক্তের কাছে ফিরে গেলেন। আমরা মহারাজের কাছে ঘটনা জানালে তিনিই যা করবার করবেন। এখন দুঃখ না করে চলুন রাজধানী যাই

হোপাক্ লাউ আসার আগেই মহারাজ স্বপ্ন দেখলেন। মহাদেব ত্রিশূল উচিয়ে রাজাকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলছেন —রে নরাধম, তুই ভক্তের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনতে চাইছিস? আমি আসবোনা। ভবিষ্যতে চেষ্টা করলে তোকে ত্রিশূল দ্বারা বধ করবো। শিবলিঙ্গ তৈরী করে প্রতিষ্টা কর আমি সন্তুষ্ট হবো।

হোপাক্ লাউ খুব চিন্তিত হয়েই রাজধানীতে এলো।

রাজধানীতে এসে শুনলো শিব লিঙ্গ যে আনা যাবেনা রাজধানীর সবাই সে কথা জানে ; হোপাক্ লাউ ভারমুক্ত হলো।

কষ্টিপাথরের বিশালাকৃতি শিবলিঙ্গ শিবচতুর্দশী তিথিতে খুব ঘণ্টা করে স্থাপন করা হলো। সাতদিন মেলা অনুষ্ঠিত হলো। প্রজাদের খাওয়ানো হলো।

মহারাজ রাজসভায় বসেছে। পাত্র-মিত্র সকলেই রাজসভায় আসীন। এমন সময় তহশীলদার মন্দির নির্মান কারী প্রধান কারিগরদের রাজসভায় হাজির করলো। এরা পুরস্কার নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে যাবে।

মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়ালো সবাই। মহারাজ মৃদু হেসে প্রধান কারিগরকে জিজ্ঞেস করলেন —কারিগর, আপনারা কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, লক্ষীনারায়ণ মন্দির, ভুবনেশ্বরী মন্দির, চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির, কৈলাগড়ে মহাশক্তি মন্দির নির্মান করেছেন। প্রতিটি কাজই সুন্দর হয়েছে। আপনারা এর চাইতে সুন্দর মন্দির আর তৈরী করতে পারবেন ?

প্রধান কারিগর হাত জোর করে উত্তর করলো—কেন পারবোনা মহারাজ, এর চাইতেও অনেক সুন্দর মন্দির তৈরী করতে পারবো।

উত্তর শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো মহারাজের, বললেন — আপনাদের বলেছিলাম আপনাদের যত ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্দির তৈরী করতে। এখন বলছেন— এইসব মন্দিরের চাইতেও সুন্দর মন্দির তৈরী করতে পারবেন। যদি তাই হয় যে সব মন্দির তৈরী করেছেন সে গুলো আরও সুন্দর ভাবে তৈরী করতে বাঁধা ছিল কোথায় ? কেন আপনারা দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করলেন ?

এবার চমক ভাঙ্গে কারিগড়ের। হাত জোর করে বলে—

মহারাজ, এই মন্দির তৈরী করতে আমরা আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছি।

—না, দেননি। আপনারা আমাকে, ত্রিপুরা বাসীকে ফাঁকি দিয়েছেন। আপনারা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন দেশবাসীর সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে। আমি আপনাদের চরম শাস্তি দেবো। আগামী গঙ্গা পূজোর গোমতীতে আপনাদের বলি দেওয়া হবে। আপনাদের পুরস্কারের টাকা আপনাদের পরিবারের হাতে পৌঁছে যাবে। যদি আপনাদের কোন বংশধর নির্মান কার্যে অংশ নেয় তবে তাকেও মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হবে।

মহারাজের আদেশ শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে স্থপতির দল। কিন্তু, মহারাজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। প্রহরীগণ এসে জোর করে স্থপতিদের ধরে নিয়ে যায়। এমন সুন্দর অনুষ্ঠানের এমন বিয়োগান্ত পরিণতি কেও কল্পনাও করতে পারেনি। সভাসদ্‌রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রাজসভা শেষ হয়।

১৫১৩খৃঃ। রসাঙ্গ থেকে দূত আসে। আরাকান রাজ- রসাঙ্গ পুনঃর্দখলে বদ্ধ পরিকর। খবর শুনে বিশাল বাহিনী নিয়ে আবার যাত্রা করে প্রধান সেনাপতি রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ।

সুবিশাল ত্রিপুর সৈন্য দেখে ভীত হয় আরকান রাজ। প্রধান সেনাপতির দূত যায় আরাকান রাজার কাছে। আরাকান যদি রসাঙ্গ পুণরায় দখল করার চেষ্টা তা হলে ত্রিপুর সৈন্য আরাকান সম্পূর্ণ দখল করবে।

ত্রিপুরার এই সেনাপতির বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছে আরাকানের সৈন্য বাহিনী। যতদিন এই সেনাপতি জীবিত থাকবে ততদিন ত্রিপুরা জয়ের বাসনা স্বপ্নই থেকে যাবে। আরাকানের মান- সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। তাই পরাজয় জেনেও আরাকান বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

রাজধানী থেকে দূত যায় প্রধান সেনাপতির কাছে। গৌর

সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে। প্রধান সেনাপতি যেন অতি সত্বর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন।

প্রমাদ গুণে প্রধান সেনাপতি। দূতের বার্তা সৈন্যের মধ্যে প্রচার হলে আরাকান রাজের সুবিধে হবে। তাই প্রধান সেনাপতি প্রকৃত তথ্য গোপণ করে প্রচার করে যে মহারাজ নির্দেশ পাঠিয়েছেন অতি সত্বর যেন আরাকান আক্রমণ ও দখল করা হয়। আরাকান রাজ যদি লোকক্ষয় রোধ করতে চান তবে শেষ বারের মত শান্তি আলোচনায় যেন মিলিত হন।

এই খবর আরাকান রাজার কানেও পৌছে। পাত্রমিত্র-গণের সঙ্গে আলাপ করে একমত হয় যে যেহেতু এই যুদ্ধেও ত্রিপুরার জয়ী হবার সম্ভাবনা সুতরাং আবার শান্তি চুক্তি করাই ভালো।

আরাকানরাজ ত্রিপুরার দূতের কাছে উত্তর পাঠায়। উভয় পক্ষের সেনাদের ভুল বুঝাবুঝির ফলেই যুদ্ধ বেঁধেছে। আরাকানের লোকক্ষয়ে বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই। পূর্বতন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতেও আরাকান ইচ্ছুক নয়। প্রধান সেনাপতি যদি শান্তি চান তবে উভয় পক্ষের সৈন্য অস্ত্র বর্জন করে যার যার শিবিরে চলে যাবে।

প্রধান সেনাপতি তাই চান। তবু-ও আরও দশ হাজার সৈন্য রসাঙ্গে রেখে এবং শান্তি চুক্তির শর্ত পালনের অঙ্গীকার দিয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে।

১৫০১ খ্রী. রসাঙ্গ জয়ের পর গৌর সেনাপতি গৌর মল্লিক আরাকানরাজকে বলেছিলেন তিনি রসাঙ্গ উদ্ধার করে আরাকান রাজকে ফিরিয়ে দেবেন। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচ হাজার গৌর সৈন্য আরাকানে পাঠিয়েছিলেন আরাকানরাজকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু, তিনি যখন খবর পেলেন গৌর সৈন্যের সাহায্য পেয়েও আরাকানরাজ ভয় পেয়ে পুনরায় সন্ধি করেছেন তখন রাগে ক্রোধে তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করলেন।

১৫১৩ খ্রীঃ। প্রধান সেনাপতি আরাকান থেকে ফিরে এসে শুনলেন বিশাল গৌর সেনা নিয়ে বিচক্ষণ সেনাপতি গৌর মল্লিক মেহেরকুল ও সোনারমুড়া দখল করে চণ্ডিগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গৌর সৈন্য সোনামুড়ার কাছে সোনারপুরে ছাউনি ফেললো। গৌর মল্লিকের এক খোজা সেনাপতি বললো—জনাব, রাঙ্গামাটি রত্নপুর, কাক্রাবন গোমতীর তীরে অবস্থিত। এই তিন নগরীই জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী। আমরা গোমতী নদীতে বাঁধ দিলে গোমতীর জলে এই তিন নগরী প্লাবিত হবে। রাজ প্রাসাদও জলমগ্ন হবে। ভয় পেয়ে ত্রিপুররাজ আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

গৌর মল্লিক খোজা সেনাপতির পরামর্শ অনুযায়ী সোনামুড়ার ভাটিতে দুর্গানগর গ্রামে গোমতীর বুকে এক বিশাল বাঁধ তৈরী করিয়ে গোমতীর জল আটক করে রাজধানী প্লাবিত করার এক হাস্যকর প্রয়াস নিলো।

ত্রিপুর বাহিনীর পরাজয় বার্তা শ্রবনে মহারাজ মনঃক্ষুন্ন, আতংকিত। ত্রিপুরার সিংহাসন বুঝি গৌর নবাবের হস্তগত হতে চলেছে। এত কষ্টের সোনার ত্রিপুরা মুসলমানের হাতে চলে যাবে। —গালে হাত দিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে।

—মহারাজের জয় হউক।

মহারাজ চমকে উঠে দুঃখের হাসি হেসে বলেন—গুরুদেব, আসন গ্রহণ করুন, আমার ভাগ্যে আর জয় লেখা হলো না। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো গৌর সৈন্য রত্নপুর এসে হাজির হবে। তখন রাজ প্রাসাদ ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোন পথ থাকবেনা।

—মহারাজ, আজ তিন দিন হলো আমি এক তান্ত্রিক অভিচার শুরু করেছি। আশা করি মহারাজের জয় হবেই হবে। শুনলাম গৌর সৈন্য গোমতীতে বাঁধ দিয়েছে?

—শুনেছি। কাক্রাবনের কিছু অংশ দু-দিনেই প্লাবিত হয়ে গেছে।

—মহারাজ যজ্ঞ শেষ হলে আমি যে চণ্ডাল যুবককে বলি দেব তার ছিন্ন মস্তক গোপনে শত্রু শিবিরে রেখে আসতে হবে। আর এ কাজে সফল হতে পারলেই আমাদের যুদ্ধে জয় হবে।

—আমি চেষ্টার ত্রুটি করবোনা। চতুর্দ্দশ দেবতার রাজ্য চতুর্দ্দশ দেবতা রক্ষার ব্যবস্থা না করলে আমার পক্ষে গৌর সৈন্যের মুকাবিলা সম্ভব নয়।

গৌর মল্লিক গোমতীতে বাঁধ দিয়ে নগর প্লাবিত করার পরিকল্পণা করেছে শুনে প্রধান সেনাপতি রায় কাচাগ বড় মুড়ায় গোমতীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে দিলো।

শীতকাল। জলের বেগ এমনিতেই কম ছিলো। কিন্তু, বড়মুড়ায় আবদ্ধ হয়ে গোমতী যেন ক্রোধে ফুঁসতে থাকে। তিন চার দিনেই বীরগঞ্জ, মৈলাক প্রভৃতি অঞ্চল জলে প্লাবিত হতে থাকে।

তিন দিন পর প্রধান সেনাপতি সৈন্যদের আদেশ দিলেন বড় মুড়ায় নদীর বাঁধ কেটে দেওয়ার জন্য। তিন দিন পর বঁধমুক্ত হয়ে ক্রুদ্ধা গোমতী মহা গর্জন করতে করতে এগিয়ে চললো। রাজধানীর বেশ কয়েক শত ঘর বাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেলো গৌর সৈন্যের কয়েক হাজার সৈনিক ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম। ধোয়ে মুছে গেলো গৌর মল্লিকের দেওয়া গোমতীর বাঁধ।

ক্রুদ্ধ গৌর মল্লিক সোনারপুর থেকে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মেলাগর, চণ্ডিগড় দখল করে নদী পার হয়ে কাক্রাবনে এসে ছাউনি ফেললো।

ত্রিপুর সৈন্য ডোমঘাটিতে গৌর সৈন্যকে বাঁধা দেওয়ার জন্য তৈরী হলো।

সাতদিন পূর্ণ হলো। শ্মশানে দেবী চামুণ্ডার কাছে এক চণ্ডাল যুবককে বলি দেওয়া হলো। ছিন্নমস্তক একটা রূপার থালায় রেখে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিন্নমস্তককে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো ছিন্নমস্তকও দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তর দিলো। শ্মশানে উপস্থিত মহারাজ ও প্রধান রাজপুরুষগণ সে ভাষা বুঝতে না পারলেও রাজগুরুর তান্ত্রিক ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলো। রাজগুরু মহারাজকে বললো—মহারাজ, আমাদের জয় হবে। এবার ছিন্ন মুণ্ড শত্রু শিবিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

মুণ্ড পাঠানোর জন্য এক সুন্দরী ত্রিপুরী রমনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। একটা থলিতে করে অশ্বারোহনে সে গৌরের শিবিরে যাবে। তার পেছনে যাবে কয়েকশত তীরন্দাজ। এদের খালি গা, গায়ে চুন কালি মাখা এবং মাথায় রং করা মাটির হাড়ি পরা থাকবে। তার পেছনে থাকবে অশ্বারোহী, তারপর পদাতিক। শীতের গভীর রাতে অবসন্ন, শীতাক্রান্ত গৌর সৈনাকে আক্রমন করতে না পারলে জয় অসম্ভব।

রায় কাচাগ স্বয়ং নিজ অশ্বে উঠিয়ে ত্রিপুর রমনী তান্ত্রিক বলাগমাকে নিয়ে কাক্রাবনে অবস্থানরত গৌর শিবিরের কাছে এসে বলাগমাকে নামিয়ে দিয়ে তার সাঁফল্য কামনা করে বিদেয় দিয়ে নিজে শাল বাগানে ত্রিপুর সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

বলাগমা একে সুন্দরী, যুবতী তারপর ডাকিনী বিদ্যায় সিদ্ধা বলে রাজবাড়ীতে তার খুব খাতির। লোকে বলে সে সম্মোহন বিদ্যায়ও পারদর্শিনী। সে নাকি অদৃশ্যও হতে পারে। রাজ-গুরু এই বলাগমার প্রশংসায় সর্বদা পঞ্চমুখ। রাজগুরুর মতে বলাগমা ডাইনি নয় সে একজন সিদ্ধা ভৈরবী।

অমাবস্যার রাত তাও আবার শীতকাল। কয়েকজন প্রহরী প্রাণের ভাগিদে প্রহরায় রতছিলো। চতুরা বলাগমা

সহজেই তাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শিবিরের এক অংশে চণ্ডাল যুবকের ছিন্ন মুণ্ডটি রেখে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে।

বলাগমার প্রত্যাবর্তনের জন্যই ত্রিপুর সৈন্য অপেক্ষা করছিল। কয়েকশত ভূত-প্রেত বেশধারী পাহাড়ী যুবক রং করা মাটির হাড়ি মাথায় দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে ঘুমন্ত গৌর সৈন্য শিবিরে হানা দিলো। বিস্ময়ে বিমূঢ় প্রহরীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই তীরন্দাজের বিষাক্ত তীরের আঘাতে ওরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

ঘুমন্ত গৌর সৈন্য এই পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। গোমতীর জল প্লাবনে তাদের বিরাট ক্ষতি হওয়ায় এমনিতেই তারা বিষন্ন ছিলো তারপর প্রচণ্ড শীতের মধ্যরাতে এহেন ভৌতিক পরিস্থিতি গৌর সৈন্য দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করলো। বিচক্ষণ সেনাপতি গৌরমল্লিকও এই অদ্ভুতপূর্ব পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভগ্ন মনোরথে পালাতে শুরু করলো।

রাজধানীতে কয়েকদিন ধরে চললো বিজয় উৎসব। মহারাজ বিজয়ী সেনাপতি রায়কাচাগকে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন এবং বলাগমাকে দিলেন নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তার মালা।

রাজসভা বসেছে। মহারাজ রাজগুরুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—গুরুদেব, আপনার তান্ত্রিক শক্তি, বলাগমার ডাকিনী বিদ্যা আর রায়কাচাগের বীরত্ব এই ত্রয়ের সমন্বয়ের ফলেই ত্রিপুরার জয় সম্ভব হয়েছে। রায়কাচাগ ও বলাগমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবার আপনি আদেশ করুন কী দিয়ে আপনার সেবা করতে পারি?

—মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ। যতটুকু ধন দ্বারা একজনের জীবিকা নির্বাহ হয় ততটুকুতেই আমার অধিকার বাকীটা রাজ্যের

প্রাপ্য। তার বেশী কিছু চাইলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হয়ে যায়। প্রজারঞ্জক হয়ে, প্রজা বৎসল হয়ে রাজত্ব করলেই আমার সেবা করা হবে।

উপস্থিত অমাত্যগণ রাজগুরুর উত্তর শুনে খুব আনন্দিত হয়। সকলের অন্তরই ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠে। চন্তাই দয়াময়ের মনে যে সামান্য ঈর্ষা রাজগুরর প্রতি জমা ছিলো তাও দূর হলো।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য ঘোষণা করলেন ত্রিপুরায় যত ব্রাহ্মণ রয়েছেন প্রত্যেককে দশটি করে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন বেলা দ্বি-প্রহরে ব্রাহ্মণগণ যেন এসে দান গ্রহন করে মহারাজকে কৃতার্থ করেন।

রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তহশীলদারদের মাধ্যমে মহারাজের ঘোষণার কথা প্রচার করা হয়। দূর দূরান্তর থেকে ধনী ও গরীব সকল স্তরের ব্রাহ্মণগণ এসে জমায়েত হতে থাকেন। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসছেন তাদের সেবার জন্য অতিথি ভবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহারাজ প্রতিদিন রাজসভার শেষে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা করে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

শুধু ত্রিপুরার নয়, মহারাজের কাছ থেকে দান গ্রহন করতে ত্রিপুরার বাইরে বসবাসকারী কিছু ব্রাহ্মণও মহারাজের কাছ থেকে দান গ্রহন করেন। বহিরাগত ব্রাহ্মণদের দুর্দশার কথা শুনে মহারাজ তাদের পনরটি করে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ মহারাজকে আশীবাদ করে বিদায় নেন।

গৌরের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের আনন্দের স্মৃতি মন্থন করতে করতে কয়েকমাস কেটে গেছে। একদিন রাজসভায় প্রধান সেনাপতি রায়কচাগ্ বললো—মহারাজ, গৌরের নবাব এই পরাজয় মেনে নিতে পারেনা। বিশাল গৌরের সুলতানের

ত্রিপুরার মতো ক্ষুদ্র রাজার কাছে পরাজয় একটা বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাই অনতি বিলম্বেই এই ক্ষত দূর করার জন্য বিশাল বাহিনী ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে এবং যুদ্ধে জয়ী হতে পারলে অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবে তাই আমাদের এখন থেকেই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার। আর গৌরেব বাহিনী দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমন করার আগেই আরাকান রাজ্যকে সম্পুর্ণভাবে ত্রিপুরার বশীভূত করা দরকার নয়তো ত্রিপুরা একই সময়ে দু-দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে তখন আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

সেনাপতি কর্ণমণি বললো—মহারাজ, আমিও প্রধান সেনানায়কের সঙ্গে একমত। আমাদের উচিত এই মুহূর্তে আরাকান আক্রমণ করে আরাকান দখল করে শর্তানুযায়ী আরাকানকে মিত্র করে নেওয়া।

রায় কসম বললো—মহারাজ, আমিও একমত। প্রধান সেনাপতি মশায় যদি যুদ্ধে আরাকান যাত্রা করেন তবে অন্য কোন্ এক বিচক্ষণ সেনাপতি রাজধানীতে থেকে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবেন। মহারাজ অনুমতি প্রদান করে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন বলেই আমি মনে করি।

প্রধান সেনাপতির সুন্দর পরিচলনায় ত্রিপুর বাহিনী আগের চাইতে অনেক বেশী আধুনীক ও সু শৃংখল। অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক কেয়ামৎ খাঁও স্বীকার করেন তিনি নিজে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হলেও প্রধান সেনাপতির কাছে অশ্বারোহনে এবং অসি বিদ্যায় তিনি শিশু। উপরন্তু, প্রধান সেনা-পতির অমিত বলশালী দেহ শত্রু পক্ষের মনোবল দর্শন মাত্রই

নষ্ট হয়ে যায়। প্রধান সেনাপতি একাই এক'শো। তার উপর তিনি পেয়েছেন আর এক বিশালদেহী অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আত্মীয় রায়কসমকে। এই দু-সেনাপতি যতদিন কার্যক্ষম থাকবেন ততদিন ত্রিপুরার কোন চিন্তা নেই। যেখানে বল-বিক্রম ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটে সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

সুদীর্ঘ ছ'মাস যুদ্ধের পর আরাকান রাজ পরাজয় স্বীকার করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ভবিষ্যতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আর কখনো অস্ত্র ধারণ করবেন না এবং রসাঙ্গ প্রদেশকে ত্রিপুরার স্থায়ী অংশ বলে মেনে নেবেন।

প্রধান সেনাপতি জানেন সন্ধি আপৎকালিন অবস্থা ব্যতিত আর কিছুই নয়। সুযোগ পেলে কেউ ই সন্ধির শর্ত পালন করে না, আরাকান রাজও করবে না। আর ত্রিপুরা থেকে এখানে স্থায়ীভাবে রাজ্য পরিচালনাও করা সম্ভব হবে না। প্রজারা যেখানে অসহযোগীতা করে সেখানে কোন শক্তিশালী রাজার পক্ষেও রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আরাকানের মগ জাতি ত্রিপুর জাতিকে কখনো ভালো চোখে দেখেনা। তাদের ধারণা ত্রিপুর জাতীর আক্রমণের ফলেই তাদের পূর্ব বংশধর লিকা রাজা লিকা তথা রাঙ্গামাটি ত্যাগ করে আরাকানে চলে আসতেও বাধ্য হয়েছিলেন।

আরাকান রাজার কাছ থেকে প্রতিবৎসর ত্রিপুরাকে কর দানের প্রতিশ্রুতি আদায় করে আরাকান রাজকে আরাকান ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

রসাঙ্গ মর্দন নারায়ন রসাঙ্গ প্রদেশকে সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত করার মানসে একটি দুর্গ ও একটি থানা স্থাপন করলেন। যে মন্দির থেকে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীকে নিয়ে এসেছিলেন সেই মন্দিরে পুনরায় পাথরের তৈরী এক কালী

মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। পাহাড়ের নিচে খনন করলেন এক দীঘি।

রসাঙ্গ প্রদেশের আইন শৃংখলার উন্নতি ঘটালেন। প্রজারা এখন বলতে শুরু করলো, ত্রিপুর রাজের শাসন ব্যবস্থা আরাকানের চাইতেও ভালো।

১৫১৫ খৃঃ অগ্রহায়ণ মাস। রাজধানী থেকে খবর এলো বিশাল গৌর সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে।

প্রধান সেনাপতি খবর পেয়ে চলে এলেন রাজধানীতে। খবর পেলেন গৌর সৈন্যরা এবার মেহেরকুল না হয়ে কৈলার গড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গে বিশাল সেনা বাহিনী। এক লক্ষ পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং একশত হাতী। দলের অধিনায়ক হয়ে আসছে গত যুদ্ধের পরাজিত দু-সেনাপতি হৈতন খাঁ এবং কড়া খাঁ।

প্রধান সেনাপতি পঞ্চাশজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে কৈলারগড় পাঠালো। বললো—তারা যেন অশ্ব গুলো কৈলা-গড়ের সেনাপতির কাছে রেখে গড়াধিপতি প্রভুরামের সাহায্য নিয়ে গৌর সৈন্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

কৈলাগড়াধিপতি নিজেও গৌর সৈন্য সম্পর্কে তথ্যাদি আনার জন্য গুপ্তচর পাঠিয়েছিল। রাজধানী থেকে পঞ্চাশজন গুপ্তচর যাওয়ায় খুশী হলো সে। দলনায়ককে বললো—এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ছাওনীর আশে পাশে গেলেই ধরা পড়বে। তার চাইতে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন পোষাকে বিভিন্ন ভাবে প্রকৃত খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শাহ সিরাজী নামে এক গুপ্তচর বললো—জনাব, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যদি মনোপূতঃ হয় তবে সে মতো কাজ

করা যেতে পারে। মেহেরকুলে সুন্দরী নর্তকী রয়েছে অনেক। খোদার ইচ্ছেয় গুপ্তচর বৃত্তি করতে গিয়ে আমাকেও নাচ গান শিখতে হয়েছে। মেহেরকুলের জনাব খোদা বক্সের কাছে এ’টি চিঠি পাঠিয়ে আমার সঙ্গে চারজন সুন্দরী নর্তকীকে দিতে বলুন। আমি নাচের দল নিয়ে খাঁ সাহেবের শিবিরের কাছে গিয়ে নাচ দেখাবো। আশা করি কিছু কিছু সৈন্য আমাদের নাচে আকৃষ্ট হয়ে শিবিরে ডেকে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে নর্তকীদের যৌবনের প্রতিও টান থাকবে। ওদের পরিকল্পনা তখন জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আর কিছু লোককে মোরগ ও পাঁঠা সহ খাঁ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিন। তারা আলাদা আলাদা ভাবে খাঁ সাহেবের সঙ্গে না হউক কোন কোন সেনা নায়কের সঙ্গে মুলাকাৎ করার চেষ্টা করে অভিপ্রায় জানতে সচেষ্ট হউক।

— উত্তম প্রস্তাব। মনে রেখো আমাদের হাতে সময় খুব কম। তিন চার দিনের মধ্যেই গৌর সৈন্য কৈলাগড়ের কাছে চলে আসবে। কৈলাগড়ের প্রান্তরে গৌর সৈন্যকে বাঁধা দিতেই হবে। আমাদের প্রধান সেনাপতির কি ইচ্ছে কে জানে?

শুনেছি প্রধান সেনাপতি ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আমাদের পরেই পাঠাচ্ছেন এবং তারা দেবীপুর এসে তাবু ফেলে অপেক্ষা করবেন।

শাহ সিরাজী নর্তকীর দল নিয়ে হাজির হলো আর বেশকিছু গুপ্তচর কেউ মোরগ বিক্রেতা, কেউ হাঁস কেউ ছাগল বিক্রেতা প্রভৃতির বেশে গৌর সৈন্যের সঙ্গে মেলা মেশার চেষ্টা করে জানতে পারলো এবারের গৌর সৈন্যদলে পদাতিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। পাঁচ হাজারের উপর অশ্বারোহী, একশত হস্তী এবং একশত ছোট বড় কামান।

দেবীপুর ও মধুপুরে ত্রিশ হাজার পদাতিক এক হাজার অশ্বারোহী, দু-শত হস্তী এবং পঁচিশটি কামান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ত্রিপুর বাহিনী। ঠিক হয় কৈলার গড়ে গৌর সৈন্যকে বাধা দেওয়া হবেনা। কৈলারগড় অতিক্রম করে এলে গৌর সৈন্যকে বাধা দেওয়া হবে। প্রভূরামকে শুধুমাত্র মন্দির রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতে বলা হলো।

১৫১৩ খৃঃ গৌর মল্লিকের নেতৃত্বাধীন গৌর সৈন্যদলে হৈতন খাঁ এবং করা খাঁ অংশ নিয়ে ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এবার তাই মেহেরকুল দিয়ে গোমতী নদীর কূল ধরে অগ্রসর না হয়ে কৈলাগড় দিয়ে আক্রমণ করা ঠিক করলো।

দেবীপুরের প্রধান দায়িত্বে রইলো কুমার ধ্বজ, বাগমায় পঁচিশ হাজার পদাতিক একশত হস্তী, এক হাজার অশ্বারোহী এবং পনরটি কামান সহ গৌর সৈন্যদের বাঁধা দেওয়ার জন্য রইলো—জামির খাঁ গড়ের দুর্গাধিপতি খরগ রায়।

১৫১৫খৃঃ অগ্রহায়ণ মাসে মধুপুরে গৌর সৈন্যকে বাঁধা দেওয়া হলো। হৈতন খাঁ এবং করা খাঁ বুঝতে পেরেছে কালক্ষেপ করলে ত্রিপুর বাহিনী আবার কোন ষড়যন্ত্র করে বসে তার ঠিক্ নেই। তাই বিশ্রাম না নিয়ে একেবারে রাঙ্গামাটিতে গিয়ে গৌরের বিজয় পতাকা উড়ানো হবে।

কৈলাগড়ের অধিপতি প্রভূরাম হাজরা মন্দির রক্ষার কাজে ব্যপৃত থাকলো। কিন্তু, হৈতন খাঁ মন্দিরের কোন ক্ষতি না করে সৈন্য বাহিনী নিয়ে মধুপুরের দিকে অগ্রসর হলো। তার কাছেও খবর ছিলো ত্রিপুর সৈন্য মধুপুরে গৌর সৈন্যকে বাঁধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

দু-দিন তুমুল যুদ্ধ হলো মধুপুরের কাছে ফাঁকা প্রান্তরে।

দু-দিন পর ত্রিপুর বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। প্রধান সেনাপতি কুমার ধ্বজ রাতে হাতির পিঠে চড়ে জামির খাঁ গড়ে গৌব সৈন্যকে বাঁধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সভাসদ্দের নিয়ে এক জরুরী বৈঠকে বসেছেন। প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো বিশাল গৌর বাহিনীকে পরাস্ত করে কী ভাবে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যায় তা ঠিক্ করা।

প্রথম যুদ্ধ জয়ের অন্যতম নায়িকা ডাইনি নামে অভিহিতা বলাগমা যুবতীও রাজসভায় উপস্থিত।

বিভিন্ন সভাসদ্দের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব আসার পর মহারাজ বলাগমার দিকে তাকালেন্। বলাগমা হাতজোর করে বললো -মহারাজ, প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আমার মোটামোটি আলোচনা হয়েছে। আমি মন্ত্রদ্বারা সাতদিন গোমতীর জল স্তম্ভন করে রাখবো। সেনাপতি মশায় নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটক করে রাখাব ব্যবস্থা করবেন। সাতদিন জল স্তম্ভন করে রাখার পর জল দ্বাবা আমি গৌর সেনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবো। যদি তা না করতে পারি, তা হলে মন্ত্রবলে গৌর সেনাপতিদেরকে ধরে এনে তাদের মাংস ভক্ষণ করবো।

বলাগমার কথা শুনে আশ্বস্থ মহারাজ, মনে মনে হাসে রায়কাচাগ। বলাগমার মতো তান্ত্রিক ফকির এবার গৌর সৈন্যদের সঙ্গেও এসেছে। বলাগমার মন্ত্র এবার বিফল হতে পারে। তবু মুখে বললো--মহারাজ, বলাগমার কথানুযায়ী ব্যবস্থা করছি।

প্রধান সেনাপতি এবারও গোমতীতে বাঁধ দিয়ে নদীকে একেবারে শুকিয়ে রেখেছে। হৈতন খাঁ গুপ্তচর নিয়োগ করেও গোমতীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে কিনা এ তথ্য জানতে পারলো না। কয়েকজন বলল -গোমতী পাহাড়ী নদী, বর্ষায় নৌ

চলাচল করতে পারে কিন্তু. শীতকালে অনেক জায়গায় নদীতে চড়া পড়ে যায় বলে নদীতে শীতে নৌকা চলেনা।

হৈতন খাঁ তবুও গোমতীকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু, ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলে গোমতী অতিক্রম করতেই হবে। আর গোমতী অতিক্রম করতে হবে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি। সমগ্র সৈন্য নিয়ে গোমতী অতিক্রম করতে একদণ্ডের বেশী সময় লাগবে না।

প্রধান সেনাপতির কৌশল হলো গৌর সৈন্যকে এবারও নদী পার করিয়ে রত্নপুর নিয়ে আসতে হবে নদীর উত্তর পারে ত্রিপুরার সৈন্যরা অপেক্ষা করবে। নদী অতিক্রম করতে গেলেই বাঁধ কেটে দেওয়া হবে।

গৌর সৈন্য জামির খাঁ গড় আক্রমণ করলো। জামির খাঁ গড় থেকে রাজধানীর দূরত্ব মাত্র বার মাইল। এখানেও দু-দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। উভয় পক্ষের প্রায় বিশ হাজার সৈন্য হতাহত হলো। আহত হয়ে খরগ রায় ধ্বজকুমারের সঙ্গে হাতীতে চড়ে রাজধানীতে পালিয়ে এলো।

জামির খাঁ গড় দখল করে গৌর সৈন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। আর মাত্র ছ'ঘরিয়া গড় দখল করতে পারলেই ত্রিপুরা হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

হৈতন খাঁ খবর পেয়েছে মহারাজ ধন্যমাণিক্য একদল সৈন্য সহ ছনগাং ও মাছিছড়ার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এক সুরক্ষিত গড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ছ'ঘরিয়া গড় দখল করে যশপুর পার হয়ে মাছিছড়ার দিকে যেতে হবে। ধন্যমাণিক্যকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে সুলতানের পায়ে ফেলতে হবে।

প্রায় তিন প্রহর প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ছ'ঘরিয়ার অধিপতি গগণ খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়ে রত্নপুর হয়ে ডোম ঘাটিতে অবস্থানরত প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হয়। রণে ক্লান্ত গগণ খাঁকে

বিশ্রাম নিতে বলে প্রধান সেনাপতি ভবিষ্যত পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত হয়।

রত্নপুরের ও রাজধানীর সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র নিয়ে আগেই নগর খালি করে দিয়েছে। যে খাদ্য অবশিষ্ট ছিলো তা রাজভাণ্ডারে জমা হয়ে গেছে। গৌর সৈন্য জোর করেও কাছাকাছি কোন অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। গোমতী জল শূন্য। ধন্য সাগরের চারপাশ ত্রিপুর বাহিনী ঘিরে রেখেছে। তোপ ঘাটির কাছাকাছি যে সমস্ত পুকুর রয়েছে সব পুকুরে বিষ লতার রস মিশিয়ে জল বিষাক্ত করে রাখা হয়েছে।

হৈতন খাঁ অভিজ্ঞ সেনানায়ক। সে জানে শত্রুপক্ষ অনেক সময় পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে রাখে তাই তোপঘাটি পৌঁছেই কিছু সৈন্যকে আদেশ দিলো সমস্ত পুকুরের জল যেন পরীক্ষা করে দেখে।

হৈতন খাঁর অনুমান সত্য হলো। পুকুরের জল এত বিষাক্ত হয়ে আছে যে সামান্য জল মুখে দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েও বহু সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়লো।

জল ছাড়া এক দণ্ডও বাঁচা যায় না। এই সত্য উপলব্ধি করে একদল সৈনিককে আদেশ দিলো অনতি বিলম্বে যেন একটি পুকুর খনন করা হয়।

একদল সৈনিক জ্বালানী সংগ্রহের কাজে গেলো, একদল গেলো ছাগল গরু খুঁজতে আর একটি দল পুকুর কাটার কাজে নিয়োজিত হলো। একটি দলকে তৈরী রাখা হলো শত্রু এলে মোকাবিলা করার জন্য। সমগ্র সৈন্য বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করে কাজে নিয়োজিত করে প্রধান সেনাপতি হৈতন খাঁ তাবুতে বসে আরামে চোখ মুদ্রিত করে ত্রিপুরা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলো।

হাজার হাজার সৈন্যের মিলিত প্রচেষ্টায় দু প্রহরের মধ্যেই খনন হয়ে গেলো মাঝারী আকারের এক দীঘি। গৌর সৈন্যরা এর নাম রাখলো হৈতন খাঁর দীঘি। স্থানীয় লোকেরা পরে এর নাম রাখলো তুরুকের পুকুর বা তুরুকের দীঘি।

যুদ্ধের গতি প্রকৃতি একেবারে অনিশ্চিত। উজীর চিন্তামনি বললো—মহারাজ, মহারাণী এবং রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কিল্লার সুরক্ষিত দুর্গে পঠিয়ে দেওয়া হউক। যুদ্ধে রাজধানীর যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় সে জন্য ডোম ঘাটিকেই এবারও প্রধান যুদ্ধ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করা হউক। প্রধান সেনাপতি কী বলেন?

—আমার মতে রাজ পরিবারের সকল মহিলা ও শিশুদের কিল্লাতে পাঠিয়ে দিয়ে মহারাজ স্বয়ং মাছি ছড়ার দুর্গে অবস্থান করুন। আমি অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে ডোম ঘাটিতে গৌর সৈন্যকে বাঁধা দেবো। গৌরের বিশাল বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এবারও কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আর পিশাচ সিদ্ধা বলাগমা এবং গুরুদেবের তান্ত্রিক অভিচারও আমাদের সহায় হবে।

প্রধান সেনাপতি রায় কাচাগ অত্যন্ত বিমর্ষ। এবার হয়তো ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা করার সুযোগ হবে না। গুরুদেবের তান্ত্রিক অভিচার এবং বলাগমার পিশাচী বিদ্যাও এবার খান ফকিরদের তুক তাকের কাছে পরাজিত হতে পারে। এবারও গৌর সৈন্যকে গোমতীর জলে ভাসানো যাবে কিনা তাও সন্দেহ আছে।

প্রহরীর অভিভাদনের স্বরে প্রধান সেনাপতির চমক ভাঙলো। প্রহরী জানালো বলাগমা প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

—সসম্মানে নিয়ে এসো।

বলাগমা এলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে প্রহরীকে কিছু পানীয় আনার আদেশ দিলো।

প্রহরী চলে গেলে বলাগমা বললো—রায় কাচাগ ভাই, আমার ডাকিনী বিদ্যা এবার তেমন কাজ করছে না। মনে হয় ফকিরদের জীনের কাছে আমার ডাকিনীরা পরাজিত হয়েছে। তুমি আমার সম্মান রক্ষা না করলে রাজ্যে আমার কোন সম্মান থাকবেনা।

—আমিতো তোমাদের উপরই অনেকটা নির্ভর করে-ছিলাম। তবে ভয় নেই, তুমি মহারাজকে বলো—মন্ত্রবলে তুমি সাতদিন গোমতীর জল স্তম্ভন করে রাখবে। আমি নদীতে বাঁধ দিয়েছি। বাঁধ ভাঙ্গার কোন কারণই নেই। সাত দিনেব মধ্যেই গৌর সৈন্যদের রত্নপুর ও রাঙ্গামাটি নিয়ে এসে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেব। মা ত্রিপুরেশ্বরী ও ভুবনেশ্বরী সহায় হলে আমা-দের জয় অবশ্যম্ভাবী। তুমি কালই মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাঁধের কাছে চলে যাও। সেখানে কিছু ক্রিয়াকাণ্ড করতে থাকো। বাকীটা আমি দেখছি।

ত্রিপুর বাহিনীর অপূর্ব বীরত্ব গৌর সৈন্যকে ডোম ঘাটিতেই আবদ্ধ করে রাখলো। এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে দিলো না। হৈতন খাঁ বুঝতে পারলো এবার শুরু হলো আসল লড়াই। সে ঠিক করলো কিছু সৈন্য ডোম ঘাটিতে রেখে বাকী সৈন্যসহ স্বয়ং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। যুদ্ধ শেষ হলো কিন্তু, আহত সৈনিকের আর্ত চিৎকারে যুদ্ধভূমি এক ভয়ানক পরিবেশের সৃষ্টি করলো।

ত্রিপুর বাহিনীর সৈন্যরা ফুলকুমারীর দিকে উচু ভূমিতে

আশ্রয় নিলো। তাদের তাবুতে যথারিতী মশাল জ্বলতে থাকলো। আসল প্রহরীর স্থান নিলো মাটির মূর্তি।

রাত দ্বিতীয় প্রহরে হৈতন খাঁ সসৈন্যে গোমতী নদীর তীরে চলে এলো। কয়েক হাজার সৈন্য নদী অতিক্রম করতেই শোনা গেল বুক কাঁপানো সেই গুরু গুরু শব্দ। হৈতন খাঁ সে শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত। সে বুঝতে পারলো এবারও তীরে এসে তরী ডোবার উপক্রম হয়েছে। সৈন্যদের বললো বন্ধুগণ, শীগ্‌গীর চলো নইলে প্রাণে বাঁচবেনা।

কয়েক হাজার সৈন্যসহ হৈতন খাঁ নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেলো কিন্তু তার অর্দ্ধেকেরও বেশী সৈন্য গোমতীর প্রবল জল স্রোতে ভেসে গেলো। হৈতন খাঁ নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কপাল চাপরাতে লাগলো।

কয়েকশত মাটির কারিগড় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রধান সেনাপতির পরামর্শ অনুযায়ী তৈরী করলো কয়েকশত মাটির মূর্ত্তি তাদের গায়ে পরিয়ে দিলো সৈনিকের পোষাক। হাতে দিলো নকল অস্ত্র।

কয়েকশত সাধারণ নাগরিক প্রধান সেনাপতির পরামর্শ অনুযায়ী সংগ্রহ করলো কয়েকশত কলা গাছের ভেলা।

সাতদিন আটকে রাখা গোমতীর জল ক্রুদ্ধ গর্জনে দু কুল প্লাবিত করে সবেগে ধাবিত হওয়ার কিছু পর শত শত কলার ভেলায় শত শত মাটির তৈরী নকল সৈনিক বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি ভেলাতে দু'তিন জন করে নকল সৈনিক বসলো। রণা গাছের তৈল দিয়ে প্রত্যেক ভেলায় একটি করে মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হলো।

বিপন্ন হৈতন খাঁ ও তার সৈন্য দল দেখতে পেলো গোমতীর প্লাবিত করা জলের ঢেউ এক তালে তালে নাচতে নাচতে

এগিয়ে আসছে শত শত রণ পোত। মশালের আলোতে সৈনিক-দের দেখা যাচ্ছে। হৈতন খাঁ বুঝতে পারলো ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার কাছে এবারও গৌর বাহিনীর পরাজয় লিখা রয়েছে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভগ্ন মনোরথে আত্ম রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হলো।

হৈতন খাঁ কয়েক হাজার সৈন্য সহ রাতের অন্ধকারেই ছুটে চললো আবার জামির খাঁ গড়ের কাছে। সেখানে গিয়ে রাতটা বিশ্রাম নিয়ে আবার দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা যাবে।

রাত প্রভাতেই ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটিতে শুরু হলো বিজয় উৎসব। মহারাজ কিল্লা দুর্গ থেকে ফিরে এসে বিজয়ী সেনাপতিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

কয়েক হাজার গৌর সৈন্য ধরা পরলো। আগে বন্দী সৈন্যদের চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হতো কিন্তু, মহারাজ বন্দী সব সৈন্যকে মুক্তি দিয়ে বললেন—নবাব হুসেন শাহকে বলো আর যেন কোন সময় ত্রিপুরা আক্রমন না করে।

বন্দী সৈন্যগণ প্রাণ ফিরে পেয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে গৌরে ফিরে গেলো।

নবাব হুসেন শাহ এই বিশাল গৌর সৈন্যের পরাজয়কে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। হৈতন খাঁকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করে গৌর থেকে বহিস্কার করলেন। ঠিক্ করলেন তিনি নিজেই এবার যুদ্ধে যাবেন।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য আবার শাসন কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। নাগরিকগণ যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিপুর্ণ জীবন যাত্রা শুরু করেছেন এমন সময় কৈলাগড় থেকে প্রভুরাম খবর পাঠালো এবার নবাব স্বয়ং যুদ্ধে আসছেন। এবারের সৈন্য সংখ্যা আগের চাইতেও বেশী।

ত্রিপুররাজ ভাবতে পারেন নি মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই

আবার গৌর বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমন করবেন। রাজগুরু চিন্তিত মহারাজকে বললেন—মহারাজ, কোন ভয় নেই। গত দু-বার যে ভাবে ভুবনেশ্বরী আমাদের রক্ষা করেছেন, এবারও করবেন। আমি তান্ত্রিক মতে অভিচার করে বসন্ত রোগ চালান দেবো গৌর সৈন্যদের উপর। গৌর সৈন্য অবশ্যই পালাতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে নবাব যেহেতু স্বয়ং এসেছেন সেহেতু তার উপরই তান্ত্রিক অভিচার করবো।

রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ স্বয়ং আশি হাজার পদাতিক তিন হাজার অশ্বারোহী এবং দুশত হস্তীসহ নবাবকে বাঁধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। আর মহারাজ ধন্য মাণিক্যকে নিয়ে রাজ গুরু ভুবনেশ্বরী মন্দিরে তান্ত্রিক অভিচারে বসলেন।

সাতদিন ধরে অভিচার চললো। প্রত্যেক দিনের খবরই দূত মারফৎ মহারাজ অবগত হচ্ছেন। এরই মধ্যে শুনলেন নবাব বাহিনী কৈলারগড় ও বিশালগড় অধিকার করে নিয়েছে। বিশালগড়ের গনিয়ামাড়ায় একটি মসজিদ নির্মানের কাজও শুরু হয়েছে! তারপর একদিন দূত খবর দিলো নবাব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বহু সৈন্যও আক্রান্ত হয়েছে। নবাবের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নবাব বিজয় অভিযান স্থগিত রেখে গৌরে ফিরে যাবেন।

ত্রিপুরার কাছে এটি সু-সংবাদ। শুরু হলো আবার আনন্দ উৎসব। রাতভর বাজী পুড়ানো হলো। শাস্ত্র পাঠ হলো। কিন্তু, সকালে মহারাজ নিজে দেখলেন তার গায়েও দু-একটা গুটি দেখা দিয়েছে। আতঙ্কিত হলেন মহারাজ। রাজগুরু বললেন—মহারাজ, এটা নিশ্চয়ই শত্রু পক্ষের কাজ। আপনি চিন্তা করবেন না, দু-একদিনের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু, এ সময়ে আপনার অসুখের খবর প্রচারিত হলে নবাবের

বাহিনী পুনরায় রাজধানীর দিকে অগ্রসর হবে। ত্রিপুরার সৈন্যের মনোবলও ভেঙ্গে যাবে।

নবাব হুসেন শাহ অসুস্থ হয়ে ফিরে গেলেন। ত্রিপুরা বিপদ মুক্ত হলো। গৌর বাহিনী চলে যাওয়ার পরই বিশালগড় এবং কৈলাগড়ও ত্রিপুর বাহিনী পুনরাধিকার করে নিলো।

ত্রিপুর সৈন্য রাজ ধানীতে ফিরে এলো। একমাস গত হয়ে গেলো কিন্তু, মহারাজ রোগ মুক্ত হলেন না। শত চেষ্টা করেও, মহারাজের রোগ নিরাময় হলো না। ১৫১৫খ্রীঃ শেষ ভাগে মহারাজ ধন্যমাণিক্য বসন্ত রোগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ হলো ত্রিপুরার এক গৌরবময় অধ্যায়ের।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—